সূচীপত্র

◆ ◆ ◆

সম্পাদকীয়

মাওলানা ক্বারী মুফতী মুহাম্মদ মসউদ আযীযী নাদভী,
প্রেসিডেন্ট, মারকায আহ্ইয়াউল-ফিকির-ই-ইসলামী
সাহারানপুর, ইউ.পি.

হাজ্জ্ব ইসলামের এক রুকুন, যা জীবনে অন্তত একবার করা ফরজ, যা - মিন্ ইস্তিতা আলায়হে সাবিলা'-র পর্যায়ে আছে। এইজন্য মুসলমানরা এই ফরজকে নিষ্ঠা ও পবিত্র আগ্রহ নিয়ে আদায় করে থাকেন। কিন্তু এই জরুরী রুকুনের পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে। এইজন্য প্রতি যুগে ওলামায়ে কেরামরা কোরআন হাদীস ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানদের জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরেরও ব্যবস্থা করা হয়। আর মসলা-মাসায়েলের জন্য পুস্তিকা ও পুস্তকও বিতরণ করা হয়। যাতে করে ঐ সমস্ত মুসলমান যারা তাদের উপার্জিত অর্থ খরচ করে হজ্বের সফর করেন তা যাতে সঠিকভাবে হয় এবং হজ্বের প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারে এ তারই এক প্রচেষ্টা, যা আমার বন্ধু আলহাজ্জ্ব কামরুদ্দিন এস. খান সাহাব তার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এই পুস্তক রচনা করেছেন যাতে হজ্জ্বযাত্রী মুসলমানরা এই পুস্তকটি পড়ে উপকৃত হন। আর প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর আদায় যথাযথভাবে করতে পারেন। আর ঐ সমস্ত ক্ষতির থেকে মানুষ বেঁচে থাকুক যা শুধুমাত্র না জানার জন্য মানুষ বিপদের মধ্যে পড়েন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে হজ্জ্ব খুবই ভাল, প্রয়োজনীয় ও বরকতময় ফরজ। হজ্জ্ব-এর পর মানুষ একেবারে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে মাসুম হিসাবে ফিরে আসে — যেমন তাকে যেন তাঁর 'মা' আজই জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু এর সাথেই এই সফর খুবই সমস্যা ও সংকটময় হয়ে তাকে, এইজন্য এই পুস্তকটি খুবই সহযোগী ও উপকারী হবে ইনশা আল্লাহ।

বেশীরভাগ হজ্জ্বযাত্রীগণের কাছে এই পুস্তকটি পৌঁছানোর জন্য "মাসিক নুকুশ-ই-ইসলাম"-এর পক্ষ থেকে ছাপানো হচ্ছে। আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থণা, আল্লাহ এই কাজকে কবুল করুন আর এর সুফল বেশী বেশী মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দাও।

পরিশেষে মুহতারম কামরুদ্দীন, এস, খান সাহেব এবং এই পুস্তকের প্রকাশক আল কলম পাবলিকেশনস, দিল্লীসহ নিজের বন্ধুর শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি এই পুস্তকটির মুদ্রণে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ সকলের ব্যবসায় বরকত দান করুন। আর উভয়স্থানে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী দান করুন।

ওয়াসসালাম

মহাম্মাদ মাসউদ আযীযী নাদভী

প্রেসিডেন্ট, মারকায আহ্ইয়াউল ফকির-ই-ইসলামী

হজ্বের সময়ের পরিচয়পত্র ও তার গুরুত্ব

হজ্বের সফরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথক পৃথক পরিচয়পত্র ও হাতে বাঁধার জন্য কড়া দেওয়া হয়, যার খুব গুরুত্ব আছে। বেশীরভাগ হাজ্বীসাহেবগন অলসতার কারণে হারিয়ে ফেলেন ও অসুবিধার সম্মুখীন হন। তার গুরুত্ব ভালোভাবে জেনে নিন, হিফাজত করুন ও সঠিকভাবে ব্যবহার করুন।

হজ্ব কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণাপত্র ও কভার নং Intimation Letter & Cover No

হজ্বের ফরম পূরণ করার পর হজ্ব কমিটির পক্ষ থেকে একটি ঘোষণাপত্র আপনার কাছে আসবে। তাতে হজ্ব সংক্রান্ত অনেক জানকারি (শিক্ষা) ও কভার নং লেখা থাকে। এই নম্বরটি আপনার জন্য খুব গুরুত্ব রাখে। হজ্বের পূর্বে ও মাঝে হজ্বের সময় এই নম্বরটাই আপনার পরিচয়ের মাধ্যম। আপনার কোন ফরম বা কোন দরখাস্ত এই নম্বর ছাড়া গ্রহণীয় হতে পারে না। এই জন্য এই পত্রটি হেফাজত করুন ও নম্বরটি স্মরণ রাখুন। এই পত্রের সাহায্যেই হজ্ব কমিটি আপনার পাসপোর্ট, উড়োহাজাজের টিকিট ও পরিচয়পত্র ইত্যাদি আপনাকে দেবেন। ঐ নম্বরের মাধ্যমেই হজ্ব কমিটি আপনার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট গ্রহণ করবেন।

পাসপোর্টের গুরুত্ব

যদি আপনার কাছে পাসপোর্ট না থাকে, কোন চিন্তার কারণ নেই। হজ্ব কমিটির পক্ষ থেকে হজ্বের জন্য এক বিশেষ পাসপোর্ট দেওয়া হয়। যেটা শুধু একবার হজ্বের জন্য ব্যবহার হয়। এটি সাদা কভারের হয়। হজ্বের সফরে এটি অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। মক্কা শরীফ পৌঁছানোর পর আপনার মুআল্লীম এই পাসপোর্টটি নিয়ে নেবেন ও ফেরার সময় এয়ারপোর্টের বাসে আপনাকে ফেরৎ দেওয়া হবে।

প্লেনের টিকিট

হজ্বকমিটির পক্ষ থেকে পাসপোর্টের সঙ্গে হজ্বে যাওয়া ও আসার টিকিট (বোডিং পাস) সঙ্গে দেওয়া হবে। যেটা আপনি দেখিয়ে উড়োজাহাজে সফর করতে পারবেন। এইজন্য এই টিকিটটি ফেরার সময় পর্যন্ত খুব ভালোভাবে হেফাজত করবেন। পাসপোর্ট থেকে পৃথক রাখবেন। মুআল্লীমকে কেবল পাসপোর্ট দেবেন, প্লেনের টিকিট দেবেন না।

পরিচয়পত্র (Identity Card)

হজ্ব কমিটির পক্ষ থেকে আপনার ছবিসহ একটা পরিচয়পত্র আপনাকে দেওয়া হবে। এটা একটু বড় সাইজের হয়। প্লাস্টিক কভারে রেখে গলায় পরার জন্য হয়। এটা সব সময় আপনি গলায় রাখবেন। অন্য কার্ড যা আপনাকে মক্কায় দেওয়া হবে, ওর পিছনে জুড়ে রাখবেন।

পরিচয়পত্রে (Identity Card) নিম্নলিখিত কথা উল্লেখ থাকে

১। আপনার নাম (Name)

২। আপনার পাসপোর্ট নম্বর (Passport No.)

৩। আপনার ব্লাড গ্রুপ (Blood Group)

৪। আপনার শ্রেণী (Category)

কড়া

হজ্ব কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে একটি স্টীলের কড়া দেওয়া হবে। তাতে নিম্নলিখিত কথা উল্লেখ থাকবে।

১। আপনার নাম

২। আপনার কভার নম্বর

৩। আপনার পাসপোর্ট নম্বর

৪। আপনার দেশের নাম

এই কড়াটি আপনি হাতে পরে নেবেন। হজ্ব থেকে ফেরা পর্যন্ত মোটেই খুলবেন না। কড়ার সঙ্গে একটি চেনও থাকে। যদি অসুবিধা হয় তাহলে চেনটি খুলে রাখতে পারেন। তবে কড়াটি অবশ্যই হাতে রাখবেন। কেননা প্রয়োজনে ওর মাধ্যমে আপনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

আল্লাহ না করেন যদি আপনি কোন কারণে অজ্ঞান হয়ে যান কিম্বা সমস্ত সামান হারিয়ে যায় তবুও আপনার কড়ায় উল্লেখ থাকা কড়ার নাম্বারের সাহায্যে আপনার পরিচয় পাওয়া যাবে। আমি এমন একটা ঘটনা শুনেছি—লোক বিনা পরিচয়পত্রে হজ্বের পূর্বে হারিয়ে গিয়ে হজ্বের পরে ভিখারীর রূপে পাওয়া গেছে। এই জন্য এই কড়াটি আপনি সর্বদা হাতে রাখবেন। গোসল করা, পায়খানা যাওয়া বা অন্য কোন সময় মোটেই খুলবেন না।

মুদ্রা পরিবর্তন (Foreign Exchange)

হজ্বে রওনা হওয়ার পূর্বে এয়ারপোর্টে আপনাকে দেওয়া হবে সৌদির টাকা (রিয়াল)। এটি আপনার সুখের সামগ্রীও বটে আবার আপনার জানেরও দুশমন।

আমার এক প্রতিবেশী ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে হজ্বে গিয়ে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর সাথীদের কাছ থেকে জানা গেল যে তার সমস্ত টাকা এয়ারপোর্টে তালাশীর নামে পুলিশ নিয়ে নিয়েছে। উনি ভেবেছিলেন জেদ্দা এয়ারপোর্টে পেয়ে যাবো। কিন্তু যখন পেলেন না খুবই চিন্তিত হলেন। ঐ চিন্তায় হার্টএটাক (Heart Attack) হয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যান।

মক্কায় যে রুমে আমি ছিলাম তারই সামনে মা-বেটি দুজনে ছিলেন। ঐ দুজনের সমস্ত টাকা হারাম শরীফে তাওয়াফ করার অবস্থায় চুরি হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বলেন মক্কায় পৌঁছেই উমরা করার ছিলো। নুতন জায়গা, নুতন সাথী, কার উপর ভরসা করি। এই জন্য সমস্ত টাকা সঙ্গেই নিয়েছিলাম। হারাম শরীফে তাওয়াফ করা অবস্থায় পকেট মেরে নিয়েছে।

আমার এক বন্ধু পেশায় মক্কায় উকিল। উনি বলেন, মক্কায় যত চুরির ঘটনা ঘটে তার বেশীরভাগ হারাম শরীফের ভিতরেই ঘটে।

আমার আর এক বন্ধু নিজের টাকা লাগেজ অর্থাৎ জিনিসপত্রের মাঝে এমনভাবে হেফাজত রেখেছিলেন কোথায় রেখেছেন নিজেই ভুলে গিয়েছেন। অনেক পেরেশান হন। সালাতুল হাজত পড়েন ও আল্লাহর কাছে দোয়া চান ও পরে তার টাকা খুঁজে পান।

এইজন্য এয়ারপোর্ট থেকে যে টাকা পাবেন তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন। মক্কায় নিজের বাসস্থানে পৌঁছানোর পর হোটেলের কাউণ্টারে টাকা জমা করে রসিদ নিয়ে নিন কিম্বা নিজের মুআল্লীমের কাছে জমা করে রসিদ নিয়ে নিন। রসিদ নিতে ভুলবেন না, নচেৎ ওখান থেকেও আপনার টাকা পাবেন না। নিজের প্রয়োজন মত কিছু কিছু টাকা ওখান থেকে নিতে পারেন। উল্লেখিত দুই জায়গায় যদি টাকা রাখা সম্ভব না হয় তাহলে নিজের সুটকেসে রাখুন তবে তালা যেন মজবুত হয়।

জেদ্দা এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর এয়ারপোর্ট থেকে আপনার বাসস্থান মক্কায় যাওয়ার পথে বাসে আপনার পাসপোর্ট নিয়ে নেবেন ও আপনাকে পরিচয় স্বরূপ তিনটি জিনিস দেওয়া হবে।

১। কব্জীর পাট্টা

মুআল্লীমের পক্ষ থেকে আপনাকে এটি দেওয়া হবে। যাতে মুআল্লীমের পাট্টা লেখা থাকবে। ঐ পাট্টার গুরুত্ব এই যে যদি আপনি কখনো মক্কায় হারিয়ে যান তাহলে ঐ পাট্টার সাহায্যে আপনাকে আপনার মুআল্লীমের অফিসে পৌঁছে দেবেন। মুআল্লীমের অফিসে পথপ্রদর্শক থাকেন। যিনি আপনাকে আপনার বাসস্থানে পৌঁছে দেবেন।

২। মুআল্লীমের পরিচয়পত্র (Identity Card)

জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে বাসে আপনার পাসপোর্ট নিয়ে নেবেন ও আপনাকে একটা পরিচয়পত্র দেবেন। যাতে মুআল্লীমের ঠিকানা, আপনার বিল্ডিং এর নাম ও আপনার কামরা নম্বর উল্লেখ থাকবে। জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে বাসে সোজা আপনাকে আপনার কামরায় পৌঁছে দেবে। মুআল্লীমের সেবক আপনার সমস্ত সামান আপনার কামরায় পৌঁছে দেবে।

কম্পিউটারিকৃত পরিচয়পত্র (Computerised I. Card)

এটা দ্বিতীয় ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র। আপনাকে মক্কায় দু-একদিন পর দেওয়া হবে। এটা প্লাস্টিকের কম্পিউটারিকৃত কার্ড। এটা একরকম আপনার পাসপোর্ট। ওতে আপনার ছবিসহ ঐ সমস্ত কথা উল্লেখ থাকে যা আপনার পাসপোর্টে উল্লেখ আছে। আইনগতভাবে প্রতি হাজ্বিকে ঐ কার্ডটি রাখা জরুরী। দেখতে চাইলে দেখানোও জরুরী। আপনি যদি মক্কা থেকে জেদ্দা বা অন্য কোন জায়গায় যেতে চান ঐ কার্ড ছাড়া আপনি যেতে পারবেন না।

আপনি যখন মক্কা থেকে মদিনায় যাবেন ওখানে আপনার অন্য মুআল্লীম থাকবেন। বাসস্থানও নুতন হবে। এই জন্য মদিনায় আপনাকে একটি বিনা ছবির কম্পিউটারিকৃত কার্ড দেওয়া হবে। সঙ্গে মুআল্লীমের পরিচয়পত্রও দেওয়া হবে। যাতে মুআল্লীমের ঠিকানা ও আপনার বাসস্থানের ঠিকানা ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। মদিনায় ১০ দিন থাকা অবস্থায় এই দুটি কার্ড হেফাজতের সঙ্গে রাখবেন। দেশে ফেরার সফরের প্রারম্ভে ঐ কার্ডের সাহায্যে আপনাকে বাস নম্বর দেওয়া হবে। ঐ বাসেই আপনাকে আপনার পাসপোর্ট ফেরৎ দেওয়া হবে। এই বাসটি আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।

৩। মুআল্লীমের পরিচয়পত্র (মীনার জন্য)

মীনা যাওয়ার পূর্বে মুআল্লীম আরো একটা কার্ড আপনাকে দেবেন। যাতে আপনার মীনার তাঁবুর নম্বর লেখা থাকবে। মীনায় এক মুআল্লীমের অধিনে অনেকগুলি তাঁবু একই জায়গায় থাকে। হেফাজতের জন্য চতুর্দিকে লোহার জানালা লাগানো আছে। গেটে মুআল্লীমের চৌকিদারও থাকে। সে আপনার কার্ড দেখার পরই আপনাকে তাঁবুর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেবে। এই জন্য মীনায় থাকা অবস্থায় এই কার্ডটিও নিজের কাছে রাখবেন। ঐ কার্ডের পিছনে নিজের হাতে নিজের তাঁবুর নিকটতম খুঁটির উপর যে নম্বর উল্লেখ থাকবে লিখে নেবেন। পুলের নামও লিখে নেবেন। এতে আপনি মীনার তাঁবুর ঠিকানা ভুলবেন না।

সফরের সামগ্রী

একজন হাজী বাড়ী থেকে হজ্বের সফরের জন্য কি কি সামান নিয়ে যাবেন, যাতে ৪০ দিন ভালোভাবে কেটে যায় এটা একটা মুশকিল প্রশ্ন। আমি ওখানের অবস্থা যা দেখেছি সেটা বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই নির্ণয় করুন।

১। খাওয়ার ব্যবস্থাপনা

বাসস্থানের (বিল্ডিং এর) প্রতি তলায় একটি বা দুটি রান্নাঘর থাকে। যাতে গ্যাস ও চুলো মুআল্লীম বা বিল্ডিং এর মালিকের পক্ষ থেকে প্রথমবার ফ্রি পাওয়া যায়। হাজ্বী সাহেবরা রান্নার সমস্ত সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যান ও রান্না করে খান। সৌদি সরকারের কানুন অনুযায়ী যে কোন খাওয়ার বস্তু সৌদি নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি দেখেছি এ বিষয়ে কখনো কাউকে ভারতীয় এয়ারপোর্টেও বাধা দেওয়া হয়না ও জেদ্দা এয়ারপোর্টেও বাধা দেওয়া হয়না। কেবল তেল, পানি ইত্যাদি কোন রকম তরল পদার্থ দুই এয়ারপোর্টে বাধা দেওয়া হয়।

মক্কা ও মদিনায় বহু পাকিস্তানি হোটেল আছে যারা ভারতীয় খাদ্যের খানা তৈরী করেন। যার মূল্য নিম্নে দেওয়া হলো।

ডাল - ৪ রিয়াল
মাংস - ৫, ৬ রিয়াল
ভাত - ২, ৩ রিয়াল
সবজী - ৪, ৫ রিয়াল

যদি আপনি এক প্লেট ডাল, মাংস বা সবজী নেন তার সঙ্গে ৩টি রুটি ফ্রি পাওয়া যায় এটা দুই থেকে তিন জনের জন্য যথেষ্ট হয়। অনেক হাজ্বী রান্নায় সময় নষ্ট না করে খানা কিনে খেয়ে নেন ও ইবাদতে পূর্ণ সময় লাগিয়ে থাকেন। এটাই উত্তম।

২। কাপড়

প্রত্যেক তলায় বাথরুম (গোসলখানা) থাকে। যাতে আপনি সহজেই কাপড় পরিষ্কার করতে পারবেন। শুকানোর জন্য আপনি বাড়ী থেকে রশি নিয়ে যাবেন। রুমের বাইরে বা বিল্ডিংএর ছাদে সহজেই শুকিয়ে নিতে পারেন। মক্কা ও মদিনায় লণ্ড্রীও আছে। একজোড়া কাপড় ধোয়ার চার্জ ৫ রিয়াল নেওয়া হয়। ওখানে নামাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকে না। এই জন্য কাপড় ময়লাও কম হয়। এই জন্য দুই বা তিন জোড়া কাপড়ে ভালোভাবে সময় কেটে যায়।

বুজর্গদের কাছ থেকে শুনেছি হজ্বের সফরে দু'দিন নূতন কাপড় পরা উত্তম। এক, ১০ জিলহজ্বের তারিখে যেদিন ঈদ হয়, আর যেদিন প্রথমবার রসুলুল্লাহর (দঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে দরুদ ও সালামের হাদিয়া সম্মুখে রাখবেন।

৩। বিছানা

মক্কা ও মদিনা দুই জায়গায় আপনার রুমে খাট, গদি, বালিশ ও একটি কম্বল, বেডশীট (চাদর) পাবেন। এই জন্য মক্কা ও মদীনায় আপনার বিছানার কোন প্রয়োজন নেই।

মীনার তাঁবুতে মেঝেতে কালীন বিছানো থাকে। কিন্তু বালিশ ও চাদর থাকে না এই জন্য আবহাওয়া অনুযায়ী একটি চাদর ও বালিশ সঙ্গে নিলে খুব উত্তম হয়।

৪। ঔষধ

সৌদি আরবে ঔষধের মূল্য খুব বেশি এবং নামও পৃথক। এই জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সৌদি সরকার ও ভারতীয় হজ্ব কমিটির পক্ষ থেকে ফ্রি ঔষধ দেওয়া হয়। তবুও আপনার শরীরের হেফাজতের জন্য আপনি স্বয়ং ঔষধ সঙ্গে নিয়ে যান। প্রয়োজনে মক্কা ও মদীনায় ভারতীয় হজ্ব কমিটির চিকিৎসালয় আছে, সেখানে ভারতীয় ডাক্তার পাবেন। ওখান থেকে আপনি ফ্রি চিকিৎসা নিতে পারেন। মীনাতেও সৌদি হাসপাতাল আছে।

৫। মোবাইল ফোন

হজ্বের সময় সৌদি সরকার হাজ্বীদের জন্য এক বিশেষ সিমকার্ড (Simcard) দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, যার মূল্য ১০০ রিয়াল। মূল্য শেষ হয়ে গেলে রিচার্জও করাতে পারেন। আপনি আপনার মোবাইল নাম্বার পাবেন যা আপনি আপনার পরিবারের লোক বা বন্ধু বান্ধবকে দিতে পারেন। যদি আপনি মোবাইল সঠিকভাবে ব্যবহার করেন অনেক উপকৃত হবেন। আপনি সর্বদা আপনার বাড়ি ও ব্যবসার খোঁজ খবর পেতে থাকবেন। এতে নিশ্চিন্তে ইবাদত করতে পারেন। হজ্বের সময় সাথীহারা হয়ে গেলে কিম্বা কোন রকম অসুবিধায় সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার সাথীদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারবেন এবং মোবাইল অপব্যবহার করলে বিপদই বিপদ। আপনি ওখানে ইবাদতের জন্য গেছেন, মোবাইলের মাধ্যমে ওখান থেকেই আপনি ব্যবসা আরম্ভ করে দেবেন না। হারাম শরীফের ভিতর মোবাইল বন্ধ রাখা উচিত।

হজ্বের সবচেয়ে মুশকিল ব্যস্ততম দিন ৮ জ্বিলহজ্ব থেকে ১৩ জ্বিলহজ্ব পর্যন্ত। এই সময়ে আপনার সফরের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

তারিখ	জায়গা	দুরত্ব	সময়
০৮ যিলহিজ্বাহ	মক্কা থেকে মদীনা	৫ কিমি	১ঘঃ
০৯ যিলহিজ্বাহ সকাল	মীনা থেকে আরাফাত	৬.৫কিমি	২ঘঃ
০৯ যিলহিজ্বাহ সন্ধ্যা	আরাফাত থেকে মুযদালফা	৫.৫কিমি	২ঘঃ
১০ যিলহিজ্বাহ সকাল	মুযদালফা থেকে মীনা	১ কিমি	½ঘঃ
১০ যিলহিজ্বাহ দুপুর	মীনা থেকে মক্কা	৫ কিমি	১ঘঃ
১০ যিলহিজ্বাহ সন্ধ্যা	মক্কা থেকে মীনা	৫ কিমি	১ঘঃ
১২ যিলহিজ্বাহ সন্ধ্যা	মীনা থেকে মক্কা	৫ কিমি	১ঘঃ

যারা পায়ে হেঁটে সফর করেন তারা বাস বা অন্য কোন গাড়ীর মাধ্যমে সফর করার চেয়ে অনেক আরামে থাকেন ও প্রতি জায়গায় সময়ে পৌঁছে যান। খালি হাতে হেঁটে যাওয়া খুব সহজ এবং সামান সহ সফর করা খুব মুশকিল। তবে মক্কা থেকে মীনা ও মীনা থেকে আরাফাতের সফরে সামান সঙ্গে থাকা জরুরী। এই জন্য সুবিধার জন্য যে ছোট ব্যাগ আপনি নেবেন যদি চাকাওয়ালা হয় তাহলে খুব সহজ হয়। মীনা থেকে আরাফাতের সফরে খুব অল্প সামানের প্রয়োজন (একটি চাটাই, পানির বোতল, অল্প খাওয়ার দ্রব্য এবং একটি চাদর)। এই জন্য এই ব্যাগটি যেন বড় না হয়। চাকাওয়ালা এই ব্যাগের সাহায্যে মীনা ও মক্কার সফরে আপনি অনেক আরাম পাবেন।

৬। দৈনন্দিন ব্যবহারিক বস্তু

প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস আপনি মক্কা ও মদিনা শরীফে পেয়ে যাবেন। এই জন্য যদি কোন জিনিস নিতে ভুলে যান পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। তবে যদি আপনার সামান ৩৫ কেজির কম হয় তবে নিম্নের দেওয়া জিনিসগুলি সাবধানতা স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে নিন।

১। খানা রাখার ও খাওয়ার জন্য প্লাস্টিক বা ফাইবারের ডিববা ও বাসন
২। দন্ত মাজন, সাবান ও মাথায় লাগানোর তৈল
৩। জায়নামাজ (মুসাল্লা)
৪। রাত্রিতে পরার জন্য কাপড়
৫। রশি ও পর্দার জন্য পাতলা কাপড় (সম্ভবতঃ আপনাকে মেয়েদের জন্য কামরায় পর্দা করার প্রয়োজন হতে পারে।)
৬। দুই জোড়া এহরাম একটি মোটা কাপড়ের ও একটি পাতলা কাপড়ের ও একটি কোমরের পাট্টা (বেল্ট)
৭। মুযদালফায় রাত্রি কাটানোর জন্য একটি চাটাই।
৮। পানির পাত্র বা বোতল যাতে আপনি হারাম থেকে আবে জমজম কামরা পর্যন্ত আনতে পারেন।
৯। এমন খাওয়ার দ্রব্য যেটা অনেদিন পর্যন্ত খারাপ না হয়। মীনা ও আরাফাতে খাওয়ার সব দ্রব্য পাওয়া যায় তবুও সাবধানতা স্বরূপ সঙ্গে রাখা উত্তম।

দুটি জিনিস এমন যার খুব বেশী প্রয়োজন নেই তবে সঙ্গে রাখলে সুবিধা হয়। এক রৌদ্রের চশমা, ২য় (Nose Mask) নাকে লাগানোর জন্য, কাগজের রুমাল। রৌদ্রের চশমায় দুপুরের সময় দুধের মত সাদা মার্বেল পাথরের মেঝেয় তাওয়াফ করার সুবিধা হয়।

যদি আপনার বেশী সর্দি থাকে বা ঘনঘন হয়ে থাকে তাহলে Nose Mask ব্যবহার করায় আপনি ও অন্য লোক Infection থেকে বেঁচে থাকবেন। নাকের রুমাল কেবল ৫ টাকায় যে কোন মেডিকেল থেকে পেয়ে যাবেন।

৭। হাত ব্যাগ

হজ্ব কমেটি বা ব্যাঙ্ক থেকে ছোট হাত ব্যাগ তোহফা স্বরূপ আপনাকে দেওয়া হবে, যেটা হজ্বের পূর্ণ ৪০ দিন আপনার সঙ্গে থাকবে ও আপনার অনেক উপকারে আসবে। ওতে দুটি পাট্টা লাগানো থাকে, একটি কাঁধে ঝোলানোর জন্য ও অন্যটি কোমরে বাঁধার জন্য। যদি দুটি পাট্টা আপনি ভালোভাবে লাগিয়ে নেন তাহলে আপনার শরীরে চিপকে থাকবে এবং ভীড়ের মাঝেও ওর হারানোর সম্ভাবনা কম থাকে। ওতে দুটি অংশ থাকে, ১টি বাইরের ছোট অংশ যাতে পরিষ্কার প্লাস্টিক লাগানো থাকে ও আপনার পরিচয়পত্র ও অন্য প্রয়োজনীয় কাগজ রাখতে পারেন। ২য় অংশে আপনি চপ্পল ইত্যাদি রাখতে পারেন। হারাম শরীফের দরজার বাইরে রাখা চপ্পল কখনো কখনো খাদিমরা ছুড়ে ফেলে দেয়। দরজার পাশে আলমারীতে রাখা চপ্পলও অন্য হাজ্বিরা পরে চলে যায়। এই জন্য চপ্পল প্লাস্টিকের থলিতে ভরে ব্যাগের ভিতর রেখে নেবেন। হারাম শরীফে কখনো দুই থেকে চার ঘণ্টা বসার প্রয়োজন হয়। এই জন্যে খাওয়ার জন্য কিছু খেজুর বা বিস্কুট ইত্যাদি সঙ্গে রেখে নেবেন। পান করার জন্য আবে জমজম হারাম শরীফের প্রত্যেক জায়জায় আপনি পাবেন। যদি এই ব্যাগটি আপনাকে তোহফা স্বরূপ কেউ না দেয় অপেক্ষা না করে বাজার থেকে অবশ্যই কিনে নেবেন।

৮। সফরের সুটকেস

হজ্বের সফরে আনুমানিক ৮ থেকে ১০ বার আপনার সামান কুলিদের হাতে সমর্পণ করতে হয়। যারা বেশীরভাগ সময় খুবই নির্দয়ের সঙ্গে এদিক ওদিক ছুড়তে থাকে। এই জন্য আপনার সুটকেস ও ব্যাগ যেন এমন মজবুত হয় সহজে না ভাঙে কিম্বা এমন হয় যেটা ভেঙে গেলে আপনার দুঃখ না হয়।

হজ্ব কমিটির পক্ষ থেকে আপনি যে পত্র পাবেন তাতে আপনাকে দুটি সুটকেস নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটা

বড় সাইজের ও অন্যটা ছোট সাইজের। বড় সাইজের সুটকেসের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা 28 x 18 x 11 ইঞ্চি ও ছোট সুটকেসের সাইজ 20 x 14 x 8 ইঞ্চি। বড় সুটকেস জাহাজে আপনার কাছ থেকে পৃথক করে অর্থাৎ সামগ্রীর সঙ্গে জাহাজে তোলার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই সুটকেসের সাইজ কম ও বেশী হলেও কোন অসুবিধা নেই। যদি অন্য আরো সুটকেস বা ব্যাগ থাকে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ওজন চেক করা হবে। অতিরিক্ত ওজনের জন্য অতিরিক্ত চার্জও নিতে পারে। আপনি কেবল ৩৫ কেজি সামান জাহাজে বিনা মূল্যে নিয়ে যেতে পারেন।

ছোট সুটকেসটি আপনি সঙ্গে নিয়ে বিমানে যেতে পারেন। এই জন্য এর সাইজ উল্লেখিত সাইজের বড় যেন না হয় ও ওজনও ১০ কেজির বেশী না হয়। নচেৎ বিমানের কর্মীরা এটাকে বিমানের ভিতরে নিয়ে যেতে দেবে না। সুটকেসের পরিবর্তে আপনার সহজ অনুযায়ী হাতব্যাগও আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি আপনার প্রতি ব্যাগ ও সুটকেসের উপর আপনার কভার নাম্বার ও বাড়ীর পূর্ণ ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না। পারমানেন্ট মারকার পেনে (পাকা কালি) লিখবেন যাতে ঠিকানা মুছে না যায়। কেননা আল্লাহ না করেন যদি আপনার সামান হারিয়ে যায় কভার নাম্বার ও ঠিকানা অনুযায়ী আপনি ফিরে পেয়ে যাবেন।

এয়ারপোর্টে দূর থেকে আপনার সামান চিনতে পারেন এজন্য ফিতে বা রং-এর চিহ্ন অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন। এতে সামান খুঁজতে সহজ হবে।

বিশেষ কথা স্মরণ রাখবেন যে, আপনার সামানের উপর অন্যদের সামানের ওজন ৫০০ কিলোরও বেশি বোঝা পড়তে পারে এই জন্য আপনার সুটকেসে বা ব্যাগে এমন কোন জিনিস না থাকে যেটা ভেঙে গেলে আপনার বা অন্যদের সামান খারাপ হয়ে যাবে। মক্কা ও মদিনা শরীফে থাকা অবস্থায় ও মীনায় তাঁবুতে মেয়েদেরকে পর্দার জন্য সম্ভবতঃ পৃথক রাখা হবে এই জন্য আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু মেয়েদের সামান থেকে পৃথক রাখবেন। নচেৎ উভয়কে পেরেশোন হতে হবে ও একে অপরকে আওয়াজ দিতে হবে।

আপনার সুটকেস মজবুত তালাওয়ালা অবশ্যই নেবেন, যাতে আপনার টাকা পয়সা সুটকেসে রেখে নিশ্চিন্তে আপনি হারাম শরীফে যেতে পারেন।

৯। সুস্থ শরীর

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যে আপনাকে সুস্থ শরীর নিয়ে যেতে হবে, কেননা মক্কায় থাকা অবস্থায় ও হজ্বের মাঝে আপনার শক্তি যত বেশী থাকবে আপনি তত বেশী ইবাদত করতে পারবেন। তাওয়াফ ও সায়ী এবং বাসস্থান থেকে হারাম শরীফ পর্যন্ত আপনাকে যতটা হাঁটতে হবে ও যতটা সময় লাগবে আনুমানিক আমি উল্লেখ করছি এতে আপনি অমুমান করতে পারবেন যে প্রতিদিন আপনাকে কতক্ষন চলতে হবে।

তাওয়াফ

ক্বাবার পাশে সাত চক্কর (ফেরা) লাগালে একবার তাওয়াফ হয়। চক্করকে আরবীতে শওত বলা হয়।

সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত, দুপুর ১.৩০ থেকে ২.৩০ পর্যন্ত ও রাত্রি ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ভীড় কম হয়। ক্বাবা শরীফের ৫০ ফুট দূরত্বে এক শওত (চক্কর বা ফেরা) লাগাতে ৩ মিনিট, ১০০ ফুটের দূরত্বে এক শওত লাগাতে ৬ মিনিট সময় লাগে। এই জন্য সাত শওতে অল্প ভীড়ের সময় ২০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিটের মাঝে সময় লাগবে। ভীড়ের সময় ৭ শওত অর্থাৎ একবার তাওয়াফ করতে ১ ঘণ্টারও বেশী সময় লেগে যায়।

বেশী ভীড়ে যখন তাওয়াফস্থলে তাওয়াফ করতে অসুবিধা হয় তখন ১ম তলা বা ছাদে তাওয়াফ করা যায়। যেখানে ১ শওতে ১৩-১৫ মিনিট সময় লাগে এই জন্য ৭ শওতে ৯১-১০৫ মিনিট সময় লাগে ও ১ তাওয়াফ পূর্ণ হয়।

সায়ী

সাফা ও মারওয়াহের মাঝে ৩৯৫ মিটারের দূরত্ব। সাফা ও মারওয়াহ দুই পাহাড়ীর মাঝে চলাকে সায়ী বলা হয়। সায়ীতে সাফা ও মারওয়াহের মাঝে ৭ চক্কর লাগাতে হয়। ১ম চক্কর সাফা থেকে আরম্ভ হয় ও ৭ম চক্কর মারওয়াহে শেষ হয়। এক চক্কর কম ভীড়ে ৪-৫ মিনিট লাগে। এই জন্য ৭ চক্করে ৩০ মিনিট সময় লাগে। ভীড়ের সময় ১ ঘণ্টারও অধিক সময় লেগে যায়।

বাসস্থান থেকে হারাম শরীফ যাওয়া আসার সময়

সাধারণত হাজীদের বাসস্থান হারাম থেকে ৫ থেকে ১৫ মিনিটের দূরত্বে হয়ে থাকে। কিন্তু ৪ জিলহজ্ব থেকে ১৫ জিলহজ্ব পর্যন্ত লোকের অত্যাধিক ভীড় হয়। ঐ সময় এই ৫ থেকে ১৫ মিনিটের দূরত্ব অতিক্রম করতে ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লেগে থাকে।

নামাজের অপেক্ষা

৪ জিলহজ্ব পর্যন্ত যেহেতু ৩০ - ৩৫ লক্ষ লোক মক্কা শরীফে পৌঁছে যান এই জন্য হারামে অত্যাধিক ভীড় হয়। যদি নামাজের জন্য ৩০ - ৪৫ মিনিট পূর্বে আপনি হারামে না পৌঁছান তাহলে সমস্ত জায়গা পূর্ণ হয়ে যায়। এই জন্য প্রত্যেক নামাজের জন্য ১ ঘণ্টা পূর্বে আপনাকে আপনার কামরা ছেড়ে দিতে হবে। হারাম শরীফ থেকে কামরা পর্যন্ত যেতে আসতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। এই জন্য লোক তাহাজ্জুদের জন্য আসে ও ফজর

পড়ে যায়। এই রকম মগরিবের জন্য আসে ও ইশা পড়ে যায়। বহুলোক জোহর থেকে ইশা পর্যন্ত হারাম শরীফেই থাকে। নামাজ, তিলাওয়াত ও তসবীহ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকে ও ইশা পড়ে যায়।

কেবল হারাম শরীফে এক নামাজের সাওয়াব একলক্ষ গুণ হয়। হারাম শরীফ ছাড়া আশেপাশের অন্য ছোট মসজিদের এই ফজিলত নেই।

যারা মক্কায় বসবাস করেন তাদের জন্য হারাম শরীফে নফল নামাজ পড়া নফল তাওয়াফের চেয়ে উত্তম। কিন্তু যারা অন্য শহর থেকে আসেন তাদের জন্য নফল তাওয়াফ, নফল নামাজ ও অন্য ইবাদতের চেয়ে উত্তম। এই জন্য প্রত্যেক হাজ্বীকে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ হারাম শরীফে পড়া উচিৎ এবং যত বেশী সম্ভব তাওয়াফ করা উচিৎ।

উল্লেখিত সময় অনুযায়ী আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন যে প্রতিদিন আপনাকে কতটা হাঁটতে হবে ও হারাম শরীফে কতক্ষণ বসে অপেক্ষা করতে হবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম, কেননা শক্তিশালী মুমিন অনেক বেশী ঐ সমস্ত কাজ করতে পারেন যা দুর্বল মুমিন করতে পারেন না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি কেবল জেহাদের জন্য ঘোড়া পালেন তাঁকে ঘোড়ার লালন-পালন ও চলাফেরার উপরও সওয়াব দেওয়া হয়।

আমি ও আপনি যদি নিজের শরীর এই উদ্দেশ্যে উন্নত করার চেষ্টা করি যে ইনশা-আল্লাহ সুস্থ শরীরে ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতির জন্য কাজ করবো তাহলে নিজের শরীরকে উন্নত করার চেষ্টাতেও আমরা সওয়াব পাবো।

ডাক্তাররা বলেন প্রতি মানুষকে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ মিনিট দ্রুত গতিতে চলা দরকার। ওতে হার্টএটাক, ভগন্দর ও অন্য অনেক অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বা সীমিত থাকে।

এই জন্য হজ্বের জন্য যেটা সর্বপ্রথম তৈরী আপনার করা উচিৎ সেটা এই যে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা কমপক্ষে ৩০ মিনিট দ্রুতগতিতে হাঁটুন ও নিজের শরীরকে সবল করার চেষ্টা করুন। হারাম শরীফে পৌঁছেও নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। হজম হওয়ার খাদ্য খাবেন। ফলের ব্যবহার বেশী করুন। সর্বদা জমজমের পানি পান করুন। গরমের দিনে যদি পানিতে পিপাসা না মেটে তাহলে ঠাণ্ডা পানি ও কোল্ড ড্রিঙ্ক এর পরিবর্তে সুলাইমানী চা (বিনা দুধের) বা কাহউয়া ব্যবহার করুন। সকালে ৪টের আগে উঠুন যাতে শান্তির সাথে আপনার প্রয়োজন মিটিয়ে তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন।

১০। সফরের সর্বউত্তম সামগ্রী

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(সুরা বাকারাহ-১৯৭)

অর্থ ঃ—সফরের সামগ্রী যেটা উত্তম সামগ্রী তা হচ্ছে আল্লাহর ভয়। (খোদাভীতি) হে বিবেক সম্পন্ন মানুষ তোমরা আল্লার ভয় অবলম্বন করো।

হজরত আদমের (দঃ) পুত্র ক্বাবিলের কুরবানী এই জন্য কবুল হয়নি কেননা তাতে আল্লাহর ভয়ের প্রেরণা ছিল না। আল্লাহতায়ালা বলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

(সুরা মায়ীদা - ২৭)

অর্থঃ— আল্লাহ খোদাভীরুদেরকেই গ্রহণ করেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়ী হজ্বের অবকাশে বলেছিলেন—

التقوى ههنا و يشير الى صدره ثلاث مرات

(মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ খোদাভীতি এখানে হয়। তিনি তিনবার নিজের ছাতির দিকে ইশারা করে বলেন।

এই জন্য হজ্বের সফরে যাওয়ার পূর্বে সমস্ত প্রস্তুতির সঙ্গে নিজের অন্তরের অবস্থা সংশোধন করে নেবেন। হাজী সাহেব বলানোর আকাঙ্খা, লোক দেখানোর, ভ্রমণের উদ্দেশ্য, খুব কেনাকাটার প্রস্তুতি ইত্যাদির যদি এরাদা করে থাকেন তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা চেয়ে নেন ও কেবল আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য সফরের প্রস্তুতি করুন।

রমযানের উমরাহ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন রমজানের উমরাহ হজ্বের সমতুল্য। কিম্বা বলেন আমার সঙ্গে হজ্ব করার সমতুল্য।

ইসাই বা ইয়াহুদীর মত মৃত্যু

মক্কার মুশরেকেরা শিরক করতো কিন্তু হজ্বও করতো। যদিও ইসায়ী বা ইয়াহুদী আল্লাহকে মানতো, পরকালের উপর বিশ্বাসও ছিল, জান্নাত ও জাহান্নামকেও স্বীকার করতো কিন্তু হজ্ব করতো না। হজ্ব ইসলামের পঞ্চম ও বিশেষ স্তম্ভ। যে ব্যক্তি হজ্ব করার শক্তি রাখা সত্ত্বেও হজ্ব না করে, এইরকম লোকের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত হাদীসের অর্থ এই যে এইরকম ব্যক্তি বিনা হজ্ব করে মারা গেলে ইসায়ী বা ইয়াহুদীর মতো মরল।

হাদিস শরীফ

হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন, যার কাছে হজ্বের সফরের সামগ্রি আছে এবং তার পৌঁছানোর জন্য যানবাহনও আছে যে ক্বাবাগৃহ পর্য্যন্ত যেতে পারে তবুও যদি ঐ ব্যক্তি হজ্ব না করে কোন পার্থক্য নেই যে সে ইয়াহুদী হয়ে মরে বা ইসায়ী হয়ে মরে এবং এটা এইজন্য যেহেতু আল্লাহতায়ালা বলেছেন, যে আল্লাহর জন্য বায়তুল্লার হজ্ব ফরজ ঐ সমস্ত লোকের জন্য যে ওখান পর্যন্ত পৌঁছানোর শক্তি রাখে এবং যে অস্বীকার করে আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের থেকে মুহতাজ নন।

হজ্বের সময় রাস্তা ভুলে যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনা

১। মক্কা মুকর্‌রমে হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনা

মক্কা-শরীফের মসজিদে ৯২টি দরজা আছে। যার উপরে নাম্বারও লেখা আছে। কিছু দরজার উপর নাম্বার লেখা নেই। যদি ওরও গণনা করা হয় তাহলে ১০০-এর অধিক হয়ে যাবে। নতুন লোকের সব দরজা একই রকম মনে হবে। এইজন্য যখন আপনি হারাম শরীফে প্রবেশ করবেন সেই দরজার নাম্বারটা স্মরণ রাখবেন এবং ঐ দরজা দিয়ে বাইরে বেরোবেন।

যখন আপনি হারাম শরীফের ভিতরে তাওয়াফস্থলে পৌছাবেন তখনও চতুর্দিকে সমস্ত দরজা একই রকম মনে হবে। চেনার জন্য সৌদী সরকার পাঁচটি বিশেষ দরজার উপর পাঁচটি পৃথক পৃথক রঙের মেহরাব তৈ্রী করে দিয়েছে। যখন আপনি হারাম শরীফে প্রবেশ করবেন ঐ রঙটি ভালোভাবে স্মরণ রাখবেন এবং ঐ সাইডের দরজা দিয়ে আপনি বাইরে বেরোবেন। দরজার মেহবার ও তার রঙ নিম্নে দেওয়া হলো।

দরজার নাম	মেহরাবের রঙ	দিক
১. বাবে আব্দুল অযীয	সবুজ	এটি ১নং দরজা, মিসফালাহ এলাকার দিকে অবস্থিত।
২. বাবে সাফা	সাদা	এটি হাজারে আসওয়াদের সম্মুখে, যেখান থেকে সায়ী আরম্ভ করা হয়।
৩. বাবে ফাতাহ	নীল	এটি মারওয়াহ পাহাড়ীর দিকে অবস্থিত।
৪. বাবে উমরাহ	বেগুনী	এটি দরজা নং ৬২।
৫. বাবে ফাহাদ	হলুদ	এটি দরজার নং ৯২। বাদশাহ ফাহাদ হারাম শরীফের একাংশ খুবই বিস্তার করেন যাতে ৮০০০০ (আশি হাজার) মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারেন। এই মেহরাবটি এই অংশে অবস্থিত।

দরজা নং ৬২-এর সামনে হারানো ব্যক্তি ও হারানো বস্তুর অফিস আছে। যদি আপনি দরজার নাম্বার ভুলে যান ও একা বাসস্থানে পৌছানোর ভরসা না করতে পারেন, তাহলে দরজা নং ৬২-এর সামনে অফিসে আপনি পৌঁছে যাবেন। অফিসের কর্মীরা আপনাকে আপনার বাসস্থানে বা মুয়াল্লিমের অফিসে পৌছে দেবেন।

২। জেদ্দা এয়ারপোর্টে হারানোর বর্ণনা

জেদ্দা এয়ারপোর্ট খুবই লম্বা চওড়া। এখানে আপনাকে বেশ কিছু সময় অবস্থান করতে হবে। আনুমানিক ৩০০ ফুট বাস ডিপো পর্যন্ত আপনাকে হেঁটে যেতে হবে। এই এয়ারপোর্টের প্রত্যেক খাম্বার উপর নাম্বার লেখা আছে। বাসডিপো পর্যন্ত গাইড আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। যদি অন্য কোন প্রয়োজনে আপনার দুরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার সামান যে খাম্বার নিকট আছে সেই খাম্বার নাম্বারটা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন।

৩। মীনায় ভুলে যাওয়ার বর্ণনা

মীনায় বেশীর ভাগ লোক এক দুইবার রাস্তা ভুলে থাকেন। এই জন্য যদি আপনি মীনার ভৌগলিক অবস্থা বুঝে নেন তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনি রাস্তা ভুলবেন না। মীনা দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত একটি পল্লির নাম। ঐ পল্লিতে মক্কার দিক থেকে প্রবেশ করার সময় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার জায়গা প্রথমে পড়বে। তারপর তাঁবুর লাইন। ঐ পল্লির অপরদিকে বাইরে বেরোলে আধ কিলোমিটার দুরত্বে মুযদালফা, আরো ছয় কিলো মিটার দূরে আরাফাতের ময়দান।

মীনা দৈর্ঘ্যে অবস্থিত। এর প্রস্থতা কম। রাস্তা ও তাঁবু না ভোলার জন্য সর্বপ্রথম আপনি পাথর নিক্ষেপের জায়গা চিনে নিন। মীনায় প্রস্থতার দিকে তিনটি ব্রীজ আছে। এদের নাম আপনি স্মরণ করে নিন। জামারাতের (পাথর নিক্ষেপের) দিক থেকে প্রথম ব্রীজের নাম কিং খালিদ ব্রীজ, ২য় ব্রীজের নাম কিং আব্দুল আযীয ব্রীজ ও ৩য় ব্রীজ মীনার বাইরে মুযদালফার সীমারেখায় এর নাম কিং ফায়সাল ব্রীজ। বেশীরভাগ ভারতীয়দের তাঁবু ১নং ও ২য় ব্রীজের আশে পাশেই থাকে। ৩য় ও সবচেয়ে উত্তম চিহ্ন আপনার তাঁবুর ঠিকানা মীনায় লাগানো খাম্বা। প্রত্যেক খাম্বার উপর নাম্বার লেখা থাকে। যদি আপনি ঐ খাম্বার নাম্বার স্মরণ রাখেন যে কেউ আপনাকে তাঁবুতে পৌঁছে দেবে।

৪। সাবধানতা ও উপায়

১ম— হোটেলে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আপনি হোটেলের ভিজিটিং কার্ড চেয়ে নিন ও সঙ্গে রাখুন।

২য়—সাবধানতা স্বরূপ একটা ছোট ডাইরী ও পেন সঙ্গে রাখুন ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নোট করুন।

ক. নিজের বাসস্থানের দিক থেকে হারাম শরীফের দরজার নাম্বার।

খ. নিজের বাসস্থানের নিকটতম বিখ্যাত হোটেল বা দোকানের নাম।

গ. মীনায় আপনার তাঁবুর নিকটতম খাম্বার নাম্বার।

ঘ. দৈনিক প্রয়োজনীয় খরচার জন্য কিছু পয়সা।

এতে আপনার ঠিকানা সন্ধান করতে সহজ হবে ও খরচ আপনার সীমার মধ্যে থাকবে।

(৩) তাওয়াফ করার ক্ষেত্রে যদি দুজনও সঙ্গে থাকেন তবুও পৃথক হয়ে যায় এইজন্য একে অপরের হাত ধরে থাকার চেয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করার সময় নির্দিষ্ট করে নেবেন কোথায় কখন মিলবেন। প্রত্যেকে হারাম শরীফে প্রবেশ করার সময় বাইরে গেটের নাম্বার, তাওয়াফস্থল বা কাবা শরীফের ভিতর দিক থেকে যে মেহরাব ঐ গেটের দিকে থাকবে তার রঙ নোট করে নিন, (গেটের উপর নাম ও নাম্বার দুই দিকেই লেখা আছে এবং সুবিধার জন্য তাওয়াফস্থলের দিক থেকে পাঁচটি বিশেষ দরজার মেহরাব এবং ভিন্ন রঙ-এর করা আছে। এতে ভোলার সম্ভাবনা কম থাকে।) তবুও তাওয়াফ করতে করতে যদি সাথী ছেড়ে যায় তাহলে সাথীর সন্ধান না করে ইবাদত জারী রাখবেন এবং প্রথমের নির্দিষ্ট স্থানে হারাম শরীফের দরজায় অপেক্ষা করবেন।

মীনা ও আরাফাতের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওখানে আপনি আগে থেকে জায়গা নির্দিষ্ট করতে পারবেন না। এইজন্য লোক নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

১) এক গ্রুপের প্রত্যেক ব্যক্তি একই রকম কোন চিহ্ন নিজেদের কাপড়ে বা দোপাট্টায় লাগিয়ে নেন। যেমন লালফিতা কিম্বা কাপড়ের ফুল ইত্যাদি । এতে অপরকে চিনতে সুবিধা হয়।

২) এক গ্রুপের কোন এক ব্যক্তির হাতে চিহ্নস্বরূপ কোন জিনিস থাকে সেটা উপরের দিকে তুলে ধরে থাকেন, যেমন পতাকা, ছাতা বা লাঠি ইত্যাদি । গ্রুপের অন্য লোকেরা ঐ চিহ্ন দেখে গ্রুপের আমীরের পিছনে পিছনে চলতে থাকেন। হারিয়ে গেলে দূর থেকে ঐ চিহ্ন দেখে খুঁজে নিন। এই দুটি পদ্ধতি তাওয়াফ করার ক্ষেত্রেও অবলম্বন করেন।

৩) তৃতীয় পদ্ধতি—মোবাইল ফোন ব্যবহার করা। কিন্তু মোবাইল ঐ সময় ব্যবহার করবেন যখন কোন বাধা না থাকে। তাওয়াফস্থল বা হারাম শরীফে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখবেন। বাইরে বেরিয়ে ব্যবহার করবেন। মসজিদের ভিতরে ব্যবসায়িক আলোচনা করার উপর ফেরেস্তা লানত পাঠান ও হারাম শরীফে একটা গোনাহ একলক্ষ গোনাহর সমতুল্য হয়ে থাকে।

★ ★ ★

জান্নাতের নির্মাণ

(১) নাফেউল খালায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে একদিন এক গ্রাম্য মানুষ রসুলুল্লাহ (দঃ) কাছে আসেন ও ক্ষিদে ও পিপাসায় কাঁদছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বললেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ইন্না আনযালনা (সুরা ক্বদর) পড়তে থাকো ও প্রত্যেক শুক্রবার নখ কাটাও। তিনি ঐ রকম করেন ও মালদার হয়ে যান।

(২) একবার এক সাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে বলেন দুনিয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ বলেন ১০০ বার **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম** পড়তে থাকো।

কিছুদিন পর ঐ সাহাবী পুনরায় আসেন ও বলেন আল্লাহতায়ালা আমায় এত মাল দিয়েছেন রাখার জায়গা নেই।

আল্লাহতায়ালা এই তসবীহকে সমস্ত তসবীহ থেকে পছন্দ করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন এই তসবীহ পড়ার দিকে সবচেয়ে সোজা ও ওজনের দিকে সবচেয়ে ভারী।

(৩) সুরা ফাতেহা খুবই বরকত পূর্ণ সুরা। আল্লাহতায়ালা কুরআনে এই সুরার প্রশংসা সাত আয়াতওয়ালী বরকতপূর্ণ সুরার নামে অভিহিত করেন। এই সুরা পড়লে রুযীতে বরকত হয়। রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কোন রকমের জ্বিন বা শয়তান যদি পেরেশান করে তাহলে ফজরের সুন্নত ও ফরজের মাঝে ৪১ বার পড়লে শয়তান দুর হয়ে যায়।

(৪) মেরাজের রাত্রিতে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) -কে বলেন জান্নাত একটি খালি ময়দান যখন বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহকে স্মরণ করে তখন জান্নাতের ময়দানে একটা সুন্দর গাছ তার জন্য লাগানো হয়। এক অন্য জায়গায় উল্লেখ আছে ফেরেস্তারা মুমিনের গৃহ জান্নাতে ঐ সময় পর্যন্ত নির্মাণ করতে থাকেন যতক্ষণ নির্মাণের সামগ্রী পৌঁছতে থাকে। যখন নির্মাণের সামগ্রী বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণের কাজও বন্ধ হয়ে যায়। নির্মাণের সামগ্রী মুমিনের নেক আমল যা দুনিয়ায় করা হয়।

(৫) দুনিয়ার জীবন এতো ব্যস্ত যে আমাদের কাছে পরকাল বা নিজের জান্নাত সুসজ্জিত করার সময়ই নেই। এখন হজ্বের সফরের জন্য ৪০ দিনের জন্য দুনিয়া থেকে ছুটি নিয়েছি, তখন এই সুবর্ণ সুযোগের সৎব্যবহার করে নিজের জান্নাতকে সুসজ্জিত করে নিই। আমরা চেষ্টা করি যে নিজের সুবিধা অনুযায়ী দরুদ শরীফ, এস্তেগফার ও তসবীহ ইত্যাদির পরিমাণ আমাদের ইবাদতের অভ্যাসে পরিনত হয়। ৪০ দিন ঐভাবে আমল করলে ইবাদতের অভ্যাস হয়ে যাবে। তারপর হজ্ব থেকে ফেরার পর ঐভাবে আমল করা সহজ হয়ে যাবে। যদি রুজির তসবীহ পড়া হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ সাওয়াবও পাওয়া যাবে এবং আর্থিক অবস্থাও উন্নত হবে।

কুরআন শরীফ পড়ারও অনেক ফজিলত আছে। এই পবিত্র সফরে কমপক্ষে দুইবার কুরআন শরীফ পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন। একটা ছোট কুরআন শরীফ সঙ্গে রাখুন।

★ ★ ★

উড়োজাহাজে সফর

(বাড়ী থেকে জেদ্দা পর্যন্ত)

হাজ্বীদের উড়োজাহাজে সিট নাম্বার থাকে না। আপনি যদি জানালার পাশে ও ভালো সিটে বসতে চান তাহলে অনেক আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যান। যেমন কোন রচনাকে দেখে সেই রচনার বৈশিষ্ট্য ও শ্লীপের অনুমান করেন, ঐ রকম আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিকে দেখে আপনি আল্লাহতায়ালার মহত্বের অনুমান করবেন। জাহাজের সফর ৫ ঘণ্টার হয়। যার প্রাথমিক ৩ ঘণ্টা সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ অতিক্রম করবে। এইজন্য আপনি কিছু দেখতে পাবেন না। কিন্তু পরে ২ ঘণ্টা যখন আম্মান ও সৌদির উপর দিয়ে অতিক্রম করবে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে পাবেন।

আমি জঙ্গল দেখেছি, যাতে কয়েক মাইল পর্যন্ত সমুদ্র ছিলো কিন্তু বালুর, অগ্নিকুণ্ড পাহাড় দেখেছি কিন্তু জড়, সৌদির ঐ এক তৃতীয়াংশে সেখানে কোন মানুষ নেই কিন্তু বিজ্ঞানের মতে এখানেও জঙ্গলী জানোয়ার সাপ, কীটপতঙ্গে পূর্ণ দুনিয়া বিদ্যমান। মহান সৃষ্টিকর্তা ওখানেও যেখানে একবিন্দু পানি নেই যাকে চান তার দুনিয়ায় বসবাস করান।

যদি আপনি আল্লার সৃষ্টি দেখতে চান তাহলে জাহাজে প্রথমে পৌঁছে ভালো সিটে বসে যান। সিট যদি সামনে বা পিছনে হয় তাহলে পরিষ্কার দৃশ্য দেখতে পাবেন। নচেৎ জাহাজের ডানায় আড়াল হয়ে যায়।

(জেদ্দা থেকে বাড়ী পর্যন্ত)

ভারত থেকে সৌদি আরবের সফরে প্রতি ব্যাক্তিকে ৩৫ কেজি ও ফেরার পথে ৫৫ কেজি সামগ্রী জাহাজে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। ১০ কেজি আবে জমজম আপনি ভারত পৌঁছে এয়ারপোর্টে পাবেন। জাহাজে পানি ও তরল পদার্থ নিয়ে যাওয়ার মোটেই অনুমতি নেই।

ভারত থেকে জেদ্দার সফরে জাহাজের কর্মীরা সামানের ওজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় না কিন্তু ফেরার পথে কড়াকড়ি করে ৫৫ কেজির অধিক হলে প্রতি কেজিতে ১৩ রিয়াল ভাড়া দিতে হবে। এই ৫৫ কেজির অধিক সামান আনবেন না। আমি ফেরার সময় এয়ারপোর্টে ৩টি ঘটনা দেখেছি যা আমি উল্লেখ করছি। এটা পড়ে আপনি নিজেই নির্ণয় করে নিন যে আপনি কি করবেন। (১) আব্দুল্লাহ ভায়ের সামানের ওজন ১৪৫ কেজি বেশি ছিল। তাই উনার ১১৭০ রিয়াল অতিরিক্ত ভাড়া ধার্য হল। অফিসারদেরকে কাকুতি মিনতি করে ১০০০ রিয়াল ঠিক হয়। আব্দুল্লাহ ভাই ১০০০ রিয়াল দিয়ে উনার সামান জাহাজে তোলেন।

(২) নিসার ভায়ের ১১ জনের গ্রুপ ছিলো। সামান অনেক বেশি ছিলো ও দেওয়ার জন্য পয়সাও ছিল না। সামান ওজন করার জন্য কয়েকজন অফিসার পৃথক পৃথক কাউণ্টারে থাকে। যার মধ্যে কিছু অত্যাধিক কঠোর আর কিছু অফিসারের অন্তরে হাজ্বীদের জন্য ইজ্জত ও সহানুভুতি থাকে। নিসার ভাই একজন কুলিকে নিজের অবস্থা বর্ণনা করেন ও বলেন কোন উপায় দেখাও। কুলিরা রহমদিল অফিসারদিগকে চেনে। কুলি নিসার ভায়ের সামান এমন অফিসারের কাছে ওজন করালো যিনি অনেকবেশি ছাড় দিলেন ও অল্প চার্জ লাগিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। নিসার ভাই কুলিকে কিছু বখশিশ দিলেন।

(৩) জাফর ভায়ের ৮ জনের গ্রুপ ছিল এবং সামান খুব বেশি ছিল। উনি এক কুলিকে ঘুষ দিয়ে সামান্য কিছু চার্জ দিয়ে বের করার সিদ্ধান্ত করেন। সামান ওজন হয়ে গেলে পয়সা না দিয়ে সামান তোলার জন্য পাঠানো হলো। কিছুক্ষন পর কুলি দৌড়ে আসে ও বলে আপনার সামান ফেরৎ করা হয়েছে। জাফর ভাই অনেক কাকুতি মিনতি করেন ও বলেন আমি অতিরিক্ত ওজনের চার্জ দিতে প্রস্তুত আছি, তবুও এয়ারপোর্টের অফিসার অনুমতি দেননি। জাফর ভাইকে নিজের বহু সামান এয়ারপোর্টে লা ওয়ারীস ছেড়ে ভারতে ফিরতে হয়। এয়ারপোর্টে ভারতীয় হজ্ব কমিটির মেম্বাররা উনাকে আশ্বাস দেন শেষ জাহাজে আপনার সামান হজ্ব কমিটির অফিসে পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু পরে কি হলো তার কোন সংবাদ নেই।

রুজীতে বরকত

হজরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন যে হজ্ব ও উমরাহ ধারাবাহিক করো কেননা হজ্ব ও উমরা দুটিই গরিবী, মুখাপেক্ষী ও গোনাহ এই রকম পরিষ্কার করে দেয় যেমন কর্মকার ও স্বর্ণকারের ভাটা লোহা ও সোনা চাঁদীর ময়লা দুর করে দেয় আর হজ্বে মবরুরের বদলা ও সওয়াব কেবল জান্নাত। (জামে তিরমিজী, নাসায়ী)

হজ্বের বিশেষ দিনে যানবাহনের বর্ণনা

(১) এহসানের প্রতিদান

আপনার বাড়ীতে যদি ১০ জন বসবাস করেন ও ২০ জন মেহমান বাইরের থেকে এসে যায় ও আপনি আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করেন তাহলে মেহমানের কি উচিৎ? মেহমানের উচিৎ যে এহসানের প্রতিদান সমতুল্য প্রতিদানের সঙ্গে আদায় করা।

هل جزاء الاحسان الاالاحسان

সুরা রহমান-৬০

অর্থঃ— উত্তম ব্যবহারের প্রতিদান উত্তম ব্যবহার ছাড়া কিছু নয়।

৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ হজ্বের সময় ও রমজানে উমরায় মক্কা শহরে উপস্থিত হন। যেটা মক্কা শহরের লোকসংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। শহরের মানুষ ও সরকার হাজ্বিদের সবরকম সেবা করেন। এই জন্য হাজ্বিদের উচিৎ যে তাঁদের রুজীর বরকত ও সুখের জন্য দোয়া করা। (মক্কায় প্রবেশ করার সময় ও বাসে এ'দুয়াটা পড়তেও থাকেন) যদি আপনার মাধ্যমে তাঁদের কিছু উপকার হয় তাহলে খুশীর সাথে হতে দিন। অন্তর ছোট করবেন না। ওখানের হোটেল, বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদির বড় রোজগারের সময় হজ্ব ও রমাজানুল মোবারক। এই দুটিই অবকাশ। এই জন্য যদি এই দুই অবকাশে আপনার এমন অনুভব হয় যে বেশি উপার্জন করছে সেটা উনাদের হক, আপনার তাঁদেরকে সাহায্য করা উচিৎ ও বেশি পয়সা অন্তর ছোট না করে দিয়ে দেওয়া দরকার।

* হজরত বরিদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন হজ্বে খরচ করা জেহাদে খরচ করার সমতুল্য।

* একটি হাদিসে হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন তোমার উমরার সওয়াব তোমার খরচের সমপরিমান। অর্থাৎ যত বেশি খরচ করা যাবে সওয়াবও ঐ রকম পাওয়া যাবে।

(২) যানবাহনের ব্যবস্থাপনা

হজ্বের সময় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ এক সময় একই দিকে সফর করে। এত বেশি লোকের জন্য একসঙ্গে যানবাহনের ব্যবস্থা করা সম্ভবই নয়। এইজন্য লোকদেরকে তিন ক্ষেপে মুআল্লীম বাসের মাধ্যমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে থাকেন। রাস্তায় লোকের ও মটরগাড়ীর ভীড়ের কারণে কোন রকমে দুক্ষেপ দিয়ে থাকে। শেষ ক্ষেপের এক তৃতীয়াংশ লোককে হয় পায়ে হেঁটে কিম্বা প্রাইভেট ট্যাক্সির মাধ্যমে সফর করতে হয়।

যারা বাসের প্রথম ক্ষেপে চড়েন তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব তৎপর ও চালাক ও যানবাহনের অসুবিধার কথা অবগত থাকেন। যারা সবার আগে পৌঁছে ধাক্কা-ধাক্কি করে বাসে বসতে পারেন, যারা ধৈর্য্য ধরে ও অপেক্ষা করে দ্বিতীয় ক্ষেপে সফর করেন তারা বেশীরভাগ সাদাসিধে, শান্তিপ্রিয় ও যানবাহনের অসুবিধা থেকে অবগত নন বা ভীড় থেকে বাঁচতে চান। শেষ ক্ষেপ দেওয়াই হয়না কেননা তৃতীয় ক্ষেপ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর সময় শেষ হয়ে যায়। এই জন্য ঐ সমস্ত লোক যারা হজ্বের ট্রেনিং নিয়েছেন, যারা সমস্যা থেকে অবগত আছেন তারা বাসের অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটে বা প্রাইভেট ট্যাক্সিতে চলে যান। উপমা স্বরূপ—যদি আপনাকে মীনা থেকে আরাফাতে যেতে হয় প্রথম বাস ফজরের নামাজের পরই সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। দ্বিতীয় ক্ষেপের জন্য প্রায় ১১টার সময় আসে ও হাজ্বিদের নিয়ে বেলা ২টো পর্যন্ত আরাফাতে পৌঁছায়। তৃতীয় ক্ষেপের জন্য বাস যদি আসে তাহলে আরাফাত পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, এই জন্য তৃতীয় ক্ষেপ সম্ভবই হয়না।

(৩) পায়ে হাঁটা কি মুশকিল?

১। মক্কা শরীফ থেকে মীনা আনুমানিক সাড়ে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার দুরত্ব।

২। মীনার দৈর্ঘ্য আনুমানিক দেড় থেকে ২ কিলোমিটার।

৩। মুযদালফা থেকে মীনা একেবারে সংলগ্ন।

৪। মীনা থেকে আরাফাত সাড়ে ৬ কিলোমিটার।

৫। সাফা ও মারওয়ার দুরত্ব ৩৯৫ মিটার।

৬। যখন আপনি ক্বাবা গৃহে মকামে ইব্রাহীমের নিকট দিয়ে তাওয়াফ করেন তখন এক চক্করে ১৫০ মিটার সফর করেন। অর্থাৎ ৭ চক্করে ১ কিলোমিটারের কিছু বেশী সফর করেন।

৭। যখন আপনি ক্বাবাগৃহে তাওয়াফ ক্বাবা শরীফের ১০০ ফুট দুরে অর্থাৎ তাওয়াফ স্থলের শেষ সীমায় করেন তখন আনুমানিক পৌনে দুই কিলোমিটার দুরত্ব আপনি চলেন।

৮। সাফা ও মারওয়াহের দুরত্ব ৩৯৫ মিটার অর্থাৎ ৭ চক্করে আপনি পৌনে তিন কিলোমিটার হাঁটেন।

৯। উমরায় যদি আপনি ক্বাবাগৃহের ১০০ ফুট দুরে তাওয়াফ করেন ও সাফা মারওয়ার ৭ চক্কর লাগান তাহলে সাড়ে চার কিলোমিটার দুরত্ব আপনাকে হাঁটতে হয়।

অর্থাৎ মক্কা থেকে মীনার দুরত্ব। যদি আপনি উমরাহ সহজে করতে পারেন তা মক্কা থেকে মীনাও সহজে এতটাই সময়ে পৌঁছাতে পারবেন।

১০। যখন আপনি মক্কায় পৌঁছেই উমরাহ করেন তখন আপনার শরীরের শক্তিরও অনুমান করে নিন। যদি আপনি সহজে উমরাহ করে নেন তাহলে মক্কা ও মীনার সফরও সহজে অতিক্রম করতে পারবেন।

১১। একবার উমরাহ করার পর কিছুক্ষণ আরাম করে যদি আপনি সাফা মারওয়ায় ৭ চক্কর আরো লাগাতে পারেন তাহলে মীনা ও আরাফাতের মাঝের দুরত্ব সহজেই অতিক্রম করতে পারবেন।

১২। লোক প্রতিদিন ৫ থেকে ৭ বার তাওয়াফ করে। এটা মক্কা থেকে মীনা কিম্বা আরাফাতের দুরত্বের চেয়ে বেশি হাঁটা হয়। যেহেতু একই স্থলে হাঁটা হয় এইজন্য সবল থাকে। মীনা ও মক্কা বা মীনা ও আরাফাতের সফর হেঁটে করা অভ্যাস না থাকার জন্য চিন্তায়

অলসতা আসে। এই জন্য আপনার প্রথম উমরার উপর ভালোভাবে চিন্তা করুন ও নিজের শক্তির অনুমান লাগান ও আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে বেশি বেশি পায়ে হাঁটার চেষ্টা করুন।

(৪) ব্যাক্তিগত পরামর্শ

আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হচ্ছে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সফর করুন।

(১) মীনা যাওয়ার পূর্বে মুআল্লীমের কাছ থেকে তাঁবুর নকশা নিন। মক্কায় নিজের বাসস্থান থেকে মীনা যাওয়ার জন্য বাসের অপেক্ষা করুন এবং বাসেই সফর করুন। কেননা মুআল্লীম ৭ তারিখের রাত্রি থেকে হাজ্বীদেরকে মীনা পৌছাতে আরম্ভ করে দেন। ৮ তারিখের ১২টা পর্যন্ত মীনায় পৌছাতে হয়। এইজন্য বাসে বেশীরভাগ ভালোভাবে জায়গা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কারন এটাও যে বাস আপনাকে আপনার তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। প্রথমবার তাঁবু খোঁজারও একটা সমস্যা থাকে। যদি মুআল্লীম রাত্রি থেকে মীনায় পৌঁছাতে শুরু না করে তাহলে সকালে খুব ভীড় ও দৌড়াদৌড়ি হবে। এই অবস্থায় আপনি সকালে ফরজের পর হাঁটতে আরম্ভ করে দিন।

যদি আপনার সঙ্গে নারী বা বৃদ্ধলোক থাকে যারা চলতে পারবে না তাহলে ধৈর্য্য ধরুন দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাসের ক্ষেপে মীনার সফর করুন। কেননা ৮ তারিখে মীনা পৌঁছে আপনাকে কেবল পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হবে। যদি আপনি বেলা দুটোয় মীনা পৌঁছান তাহলেও পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ সহজেই পড়তে পারবেন।

যদি আপনি হাঁটতে পারেন ও আপনার কাছে মীনার নকশাও থাকে এবং তাঁবু খুঁজে নেওয়ার সাহস থাকে তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে দিন।

মীনায় ১টি তাঁবুতে আনুমানিক ৭০ জনকে রাখা হয়। লোক বড় মুশকিলে তাঁবুতে শুতে পারেন। যারা মীনায় প্রথমে পৌঁছে যান বেশি বেশি জায়গা ঘিরে নেন যার জন্য যারা শেষে পৌঁছায় তাদের সামানও ঠিকমত রাখার জায়গা থাকে না। এমন অবস্থায় ধৈর্য্য ধরুণ কোন কোণে সামান রেখে দ্বীনদার লোককে একত্রিত করুন ও মেয়েদের পর্দার জন্য তাঁবুর মাঝে পর্দা লাগিয়ে দিন ও মেয়েদেরকে এক সাইডে করে দিন। এইভাবে সকলের বেশী করে ঘেরা জায়গা মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর ইনশাফ মতো পরামর্শ করে প্রত্যেকে সুবিধামত জাগয়া নিন। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী চললে কেবল পরকালেই নয় ইহকালও সহজ ও সরল হয়ে যায়।

(২) মীনা থেকে আরাফাতের সফরের জন্য যদি বাস বিনা ধাক্কায় সহজে পেয়ে থাকেন তাহলে ঠিক আছে নচেৎ প্রাইভেট ট্যাক্সিতে সফর করুন। হেঁটে যাবেন না কেননা আপনার পূর্ণ শক্তি সারাদিনের ইবাদতের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আরাফাতের নিকট পৌঁছে আপনি একটা মানুষের সমুদ্র দেখতে পাবেন। কিন্তু সাবধান যেখানে লোক থাকবে সেখানে আরাফাতের ময়দান হওয়া জরুরী নয়। আরাফাতের ময়দান একটি সীমিত জায়গা। যার চিহ্ন দেওয়া আছে। আরাফাতে অবস্থান করা ফরজ। এই ফরজ যেন আদায় হয়। মসজিদে নামরার কিছু অংশ ও আশেপাশের অনেক অংশ আরাফাতের সীমার মধ্যে গন্য নয়। যখন আপনি আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ করতে যাবেন আরাফাতের সীমার বোর্ড দেখে নেবেন।

মুযদালফা থেকে আরাফাতের দিকে মোট ১১টি রাস্তা আছে। যার মধ্যে ২টি কেবল পায়ে হাঁটার জন্য এবং ৯টি মটরগাড়ীর জন্য। পায়ে হাঁটার ২টি রাস্তা মসজিদে আশাআরুল হারাম-এর পাশ দিয়ে যায়। এর মধ্যে রাস্তা নাম্বার ১ মসজিদে নামরা ও রাস্তা নাম্বার ২ জাবালে রহমত পর্যন্ত গেছে। এই রাস্তার উপর তরীকুল মাশাত রক্বম-১ বা ২ লেখা থাকবে। পায়ে হাঁটার সড়ক নাম্বার ১ মটর গাড়ীর রাস্তা নাম্বার ৪ ও ৫ এর মাঝে আছে। পায়ে হাঁটার রাস্তা নাম্বার ২ মটর গাড়ীর রাস্তা নাম্বার ৭ ও ৮এর মাঝে আছে। আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ করার সঙ্গেই সমজিদে নামরা পাবেন। ওর মুযদালফার দিকের এক অংশ আরাফাতের সীমায় গন্য নেই। কিন্তু জাবালে রহমত আরাফাতের সীমার মধ্যে গন্য। এই দুই জায়গায় খুব ভীড় হয়। যদি আপনার গ্রুপে বেশী লোক থাকে বা দূর্বল লোক ও মেয়েছেলে থাকে ঐ দুই জায়গা থেকে দুরে রাখবেন। নচেৎ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

(৩) প্রতি বৎসর ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ লোক হজ্ব করেন। কিন্তু মক্কা থেকে মীনা ও মীনা থেকে আরাফাতের সফর ৩-৪ ঘণ্টা তফাতে করে অর্থাৎ কেউ ৩ ঘণ্টা পূর্বে ও কেউ ৩ ঘণ্টা পর সফর আরম্ভ করে। কিন্তু আরাফাত থেকে মুযদালফা ফেরার সফর লোক একসঙ্গে একই সময়ে সুর্য্য অস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করে। এই জন্য ঐ সমস্ত গাড়ী যেগুলি আরাফাতের শেষ সীমায় অর্থাৎ মসজিদে নামরা থেকে বহুদুরে থাকে তারা একই জায়গায় তিন থেকে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে যায় ও মুযদালফা রাত্রি তিন বা চারটেয় পৌছায় যার জন্য মগবির ও ইশার নামাজ কাজা হয়ে যায়।

মুযদালফার রাত্রি বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে শবে কদরের কেবল ফজিলত বর্ণনা করেছেন যে, এক রাত্রি হাজার রাত্রি হইতে উত্তম। কিন্তু আল্লাহতায়ালা মুযদালফার রাত্রিতে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করার আদেশ কুরআন শীরফে এইভাবে দিয়েছেন, যখন আরাফাত থেকে ফিরতে থাকবে মাশআরে হারাম (অর্থাৎ মুযদালফায়) আল্লাহকে স্মরণ করো। ঐভাবে স্মরণ করো যেমন তোমায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর পূর্বে তোমরা (এই পদ্ধতি থেকে) অবগত ছিলে না। সুরা বাক্বারাহ-১৯৮

যদি মুযদালফায় আপনি সময় মতো পৌঁছে ইবাদত করতে চান তাহলে পায়ে হাঁটা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আরাফাত থেকে মুযদালফা আনুমানিক ছয় কিলোমিটার। আরাফাত থেকে মুযদালফার সফরে ২০ লক্ষ লোক আপনার পাশে হেঁটে সফর করবে। এত লোকের সঙ্গে আপনাকে হাঁটতে খুব ভালো লাগবে। যদি আপনি বিশ্রাম নিয়ে চলেন তবু ২ থেকে ৩ ঘণ্টায় আপনি মুযদালফায় পৌঁছে যাবেন।

যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন মেয়েছেলে বা বৃদ্ধলোক সঙ্গে থাকে তাহলে ট্যাক্সিতে সফর করুন, কেননা আসরের নামাজের পরই বাসের ছাদ পর্যন্ত ভরে যায়। আরাফাতের ময়দানে দোয়ার আসল

ওয়াক্ত আসর থেকে মগবির পর্যন্ত।

ঐ সময় আপনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে ইবাদত করুন। নিশ্চিন্তায় মগরিবের সময় চলতে আরম্ভ করুন।

মুযদালফা ও মীনার সীমারেখা মিলিত এবং এখন মীনার তাঁবুর জায়গা কম হওয়ার কারনে মুযদালফার ভিতরে তাঁবু লাগানো হয়। এই জন্য এই সফরটা আপনি হেঁটেই করুন। তাছাড়া নিকটে হওয়ার জন্য সম্ভবতঃ কোন যানবাহনও পাবেন না।

তাওয়াফে যিয়ারত

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে মক্কা শরীফ থেকে মীনার দুরত্ব সাড়ে চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার। এতটা দুরত্ব তো আপনি একটা উমরায় পায়ে হেঁটে থাকেন। মক্কা থেকে মীনা বা মীনা থেকে মক্কার সফর আপনি হেঁটেই করুন। যদি আপনি পায়ে হাঁটেন তাহলে এই সফরটা ৩০ মিনিটে আপনি করতে পারবেন। গাড়ীতে ২ থেকে ৩ ঘণ্টাও লাগতে পারে। যানবাহনে অসুবিধার দিকে লক্ষ্য দিয়ে সৌদি সরকার সীমিত সফরের জন্য উন্নত রাস্তা ও সুরঙ্গ তৈরী করে দিয়েছে। রাস্তায় ছায়া ও পানিরও ব্যবস্থা করা আছে। যদি আপনি ট্রলী নিয়ে থাকেন তাহলে আরো সুবিধা হয়ে যাবে। মীনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে পায়ে হাঁটার আরো একটা কারন এটাও আছে যে আপনাকে ১২ তারিখে মগরিবের পূর্বে মীনা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। নিজ তাঁবু থেকে যদি আপনি হেঁটে রওনা হন নিশ্চিন্তায় মীনা থেকে মগরিবের পূর্বে বেরিয়ে যাবেন। বাসের সফরে যদি রাস্তা জ্যাম হয় তাহলে কখনো কখনো বাস বা ট্যাক্সি এক দুই ঘণ্টা জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। এই জন্য আপনি যদিও সঠিক সময়ে রওনা হন কিন্তু গাড়ীতে বসে বসে মীনাতেই সূর্য্য অস্ত যায়, তাহলে আপনার জন্য মীনাতেই অবস্থান করা উচিৎ।

হারামের ট্যাক্সি ড্রাইভার

হারামের ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে আপনার মক্কায় থাকা অবস্থায় নিজেকে সাবধান রাখুন এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারের উপর কখনো ভরসা করবেন না। তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগ বিদেশী ও অসৎ প্রকৃতির। এদের মাধ্যমে ধোকা দেওয়া বা লুটে নেওয়ার ঘটনা বেশীর ভাগ ঘটে থাকে।

প্রথমে কে?

আমি একজন ৫০ কেজি ওজনের রোগা মানুষ। যখন মুসাল্লায় দাঁড়াই অর্ধেক মুসাল্লা খালি থেকে যায়। হারাম শরীফে আমার ঐ জায়গায় নামাজ পড়ার খুবই ইচ্ছা ছিলো যেখান থেকে কাববাগৃহ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্য সময়ের পূর্বেই হারামে পৌঁছে যেতাম ও সঠিক জায়গায় মুসাল্লা বিছিয়ে বসে থাকতাম। আস্তে আস্তে নামাজের সময় যত নিকটে আসে লোকের ভীড় বাড়তে থাকে। যখন সমস্ত জায়গা ভর্তি হয়ে যায়। লোক দুই নামাজীর মাঝে সামান্য জায়গায় বসতে থাকে।

যেহেতু আমার অর্ধেক মুসাল্লা খালি থাকতো এই জন্য আমার পাশে কেউ না কেউ অবশ্যই এসে বসতো। আর যদি কোন মোটা-সোটা হাজি এসে যেতো ধীরে ধীরে সে মুসাল্লার মাঝে হতো আর আমি সাইডে। এইভাবে আমায় বেশীরভাগ দুই মুসাল্লার মাঝে নামাজ পড়তে হতো। এটা আমি পছন্দ করিনা।

একদিন আমি অন্তরে ঠিক করে নিলাম যে আগামীতে কাউকে আমার মুসাল্লায় জায়গা দেব না। এটা আমার কেবল ইচ্ছা ছিলো। দ্বিতীয় দিন থেকে আমার পছন্দনীয় জায়গায় নামাজ পড়ার তৌফিক ছিনিয়ে নেওয়া হলো। আমি নিজেই দেরীতে যেতে আরম্ভ করি ও অপরকে আবেদন করে মাঝে জায়গা করে বসতে থাকি। এমনকি কোন কোন দিন মুসাল্লায় নিয়ে যাওয়া হতো না। জানুয়ারী মাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফের মতো ঠাণ্ডা মেঝেয় কোনভাবে বা কিনারায় নামাজ পড়তাম। শেষে অনেক তওবা ও ক্ষমা প্রার্থণার পর তৌফিক নসিব হয়।

কোন হাজ্বীর উপর কেবল ভুল ধারনার এই সাজা যে আল্লাহ ইবাদতের তৌফিক ছিনিয়ে নেন। যারা হাজ্বীদেরকে কষ্ট দেন তাঁদের পরিনাম কি হবে?

যে কেহ আল্লাহর ঘরে আসেন সে আল্লাহর মেহমান ও আল্লাহ মেজবান (সেবাকারী)। যদি মেজবানকে সন্তুষ্ট করতে হয় তার মেহমানের সেবা করা নিজের লক্ষ্য মনে করতে হবে। আপনি মেহমানের মাঝে ঝগড়া করে, ধাক্কা দিয়ে, পিছনে ফেলে ও কষ্ট দিয়ে কখনো মেজবানকে (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। আল্লাহ না করেন যে আপনারও ইবাদতের তৌফিক ছিনিয়ে নেওয়া হয়, বা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই জন্য এয়ারপোর্টে, বাসস্ট্যাণ্ডে বা অন্য কোথাও যখন আপনার কাছে এ প্রশ্ন আসবে যে প্রথমে কে? আপনার জবাব হওয়া উচিৎ প্রথমে আল্লাহর অপর মেহমান ও পরে আমি।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়ী হজ্বের সময়ে বলেছেন

ان دماء كم و اموالكم و اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد كم هذا في شهر كم هذا (بخاري شريف)

অর্থাৎ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান, তোমাদের উপর ঐরকম হারাম নিষিদ্ধ যেমন আজকের দিনে এই শহরে ও এই মাসে হারাম করা হয়েছে। নবীজী বলেছেন,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

(বোখারী শরিফ)

অর্থাৎ মুসলমান উনি যার জবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান শান্তিতে থাকে। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন হজ্ব ও উমরাকারী আল্লাহতায়ালার মেহমান। যদি তারা আল্লার কাছে দোয়া করেন আল্লাহ কবুল করবেন এবং যদি ক্ষমা প্রার্থণা করেন আল্লাহপাক ক্ষমা করবেন।

হারাম শরিফ ও মীনায় থাকা অবস্থায় পর্দার বর্ণনা

১। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে এহরাম অবস্থায় থাকতাম কিন্তু যখন গায়ের মুহরিম পুরুষ আমাদেরকে অতিক্রম করতো আমরা পর্দা করে নিতাম।

২। এহরাম অবস্থায় মেয়েদের হাত (কব্জী পর্যন্ত) ও মুখমণ্ডল খোলা থাকা জরুরী কিন্তু ইসলামে পর্দার যে আদেশ আছে সেটা খতম হয়না। এহরাম অবস্থায় মেয়েদেরকে ঐরকমই পর্দা করতে হবে যেমন বিনা এহরামে করতে হয়।

৩। মক্কা ও মদিনা শরীফে অবস্থানকালে একটি কামরায় ছয় থেকে আট জন বা আরো অধিকজনকে রাখা হয়। যদি সব লোক বৃদ্ধ বা বোজর্গ হয় তাহলে কোন অসুবিধা হয় না। যদি তার মধ্যে যুবক বা অল্প খোদাভীরু হয় তাহলে তাদের মেয়েদের থেকে বিনা পর্দায় শোয়া বসা খুব দোষনীয় ও অসুবিধার কারন হয়। কামরায় ঘরের মালিকের পক্ষ থেকে কোন পর্দার ব্যবস্থা থাকে না। পর্দার জন্য আপনাকে বাড়ী থেকে পর্দার কাপড়, রশি ও পেরেক ইত্যাদি নিয়ে যেতে হবে ও বাড়ীর মালিকের অনুমতি নিয়ে কামরায় গজাল বা পেরেক লাগিয়ে পর্দা করতে হবে। এই জন্য হজ্বের সফরে যাওয়ার পূর্বে এই সমস্ত বস্তু সঙ্গে নেবেন। পর্দার রশি ও কাপড় ইত্যাদি ফেরার সময় আপনার সামগ্রীর উপর বাঁধারও কাজে আসবে।

৪। মীনায় আনুমানিক ৭০ জন পুরুষ ও স্ত্রীকে একটি তাঁবুতে থাকতে হয়। এই তাঁবু 30 x 40 ফুটের হয়। সরকার ঐ তাঁবুতে কুলার ও আলোর খুব ভালো ব্যবস্থা রেখেছে। তাছাড়া তাঁবুর মাঝে পর্দারও ব্যবস্থা আছে যেটা প্রথমে গুটিয়ে রাখা থাকে।

মক্কায় যারা আপনার কামরায় বা প্রতিবেশী ছিলেন তারাই আপনার মীনার তাঁবুতে সঙ্গি হবেন। মক্কায় থাকা অবস্থায় খোদাভীরুদের চিনে নিন। যদি সম্ভব হয় পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে নিন যে মীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম পর্দার ব্যবস্থা ও জামাতে নামাজের ব্যবস্থার কাজ করা হবে। এটা খুবই দরকারী কাজ, পূর্ব থেকেই আট, দশ জন লোককে এই কাজের জন্য সচেষ্ট করা খুবই জরুরী।

এক পরিবারের স্ত্রী ও পুরুষের সামান ও খাওয়া-দাওয়া এক সঙ্গেই হয়ে থাকে। এই জন্য বেশীরভাগ লোক অপছন্দ করেন ও পর্দার জন্য রাজি হন না। কিন্তু যখন ৮-১০ জন লোক পর্দার গুরুত্ব দেবেন তখন অন্য লোকেরা মেনে নেয়। কেননা এটা শরীয়তের আদেশও মান্য করা হয়।

মীনা পৌঁছে সমস্ত সাথীদেরকে একত্রিত করে নেবেন। বিচক্ষণতার সঙ্গে লোকদিগকে সন্তুষ্ট করে তাঁবুর মাঝের পর্দা সরিয়ে স্ত্রীরা একদিকে ও পুরুষরা অন্যদিকে হয়ে যাবেন।

৫। হজ্বের সময় হারাম শরীফে বেশীরভাগ সময় তাওয়াফের জন্য খুব ভীড় থাকে। বিশেষ করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে। ঐ সময় বেশীরভাগ একে অপরের শরীর স্পর্শ হয়ে থাকে। যদি পিছন থেকে লোকের ধাক্কা আসে নিজেকে সামনের দিক থেকে সামলানো বড় মুশকিল হয়ে ওঠে।

এই জন্য যদি সম্ভব হয় মেয়েদেরকে অল্প ভীড়ের সময় তাওয়াফ করতে বলুন, যে সকাল ১১টা, দুপুর ২ থেকে ৩টে ও রাত্রি ১টা থেকে ৩টে ইত্যাদি। প্রথম তলায় বা ছাদে ভীড় কম হয়। এই জন্য ওখানেও তাওয়াফ করা ভালো কিন্তু প্রথম তলা বা ছাদের আয়তন অনেক বেশী হওয়ার কারনে পরিশ্রমও বেড়ে যায়।

৬। মেয়েদের পিছনে বা পাশে পুরুষদের নামাজ হয়না। এইজন্য হারাম শরীফে পুলিশরা মেয়েদেরকে পিছনের কাতারের দিকে পাঠাতে থাকে। যদি আপনি হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তাওয়াফের জন্য মেয়েদেরকে সঙ্গে রাখেন তাহলে নামাজের কিছুক্ষণ পূর্বে তাদেরকে নামাজের জায়গায় বসিয়ে দেবেন ও নামাজের পর আবার সঙ্গে নিয়ে নেবেন। নচেৎ একজন স্ত্রীর জন্য কমপক্ষে তিনটি পুরুষের নামাজ অশুদ্ধ হবে। একজন যিনি ডানদিকে থাকবেন, দ্বিতীয় যিনি বামদিকে ও তৃতীয় যিনি পিছনে থাকবেন। এই সকলের গোনাহ আপনার উপর হবে।

বাচ্চাদের হজ্ব

হজরত সাইব বিন ইয়াযিদ হইতে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা বিদায়ী হজ্বে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে আমায় হজ্ব করিয়ে ছিলেন। ঐ সময় আমি ৭ বৎসরের ছিলাম।

বাচ্চার হজ্বের সওয়াব মা পাবেন

হজরত ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) রওহা নামক একজায়গায় একটি গোত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কে? বলেন আমরা মুসলমান। আপনি কে? বলেন আমি আল্লাহর রসুল। এক মহিলা বাচ্চাকে তুলে ধরে দেখান ও জিজ্ঞাসা করেন এর জন্যও কি হজ্ব শুদ্ধ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন হাঁ, কিন্তু এর সওয়াব তুমি পাবে।

মীনায় অবস্থানকালে জামাত সহ নামাজের বর্ণনা

(১) মীনায় পৌঁছে পর্দার পর দ্বিতীয় সবচেয়ে বিশেষ ও কঠিন কাজের ব্যবস্থা যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে তাঁবুতে জামাত সহ নামাজের ব্যবস্থা করা। মীনায় একটি মসজিদ আছে। নাম খায়েফ। যদি তাঁবু এই মসজিদ হইতে দুরে হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে পৌঁছানো কঠিন হয়ে ওঠে।

(২) মীনায় অবস্থানকালে ইবাদতের জন্য আল্লাহতায়ালা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন—

● যখন হজ্বের সমস্ত কাজ থেকে মুক্ত হবে তখন মীনায় আল্লাহকে স্মরণ করো যেমন তোমাদের পিতা-মাতা ও দাদাকে স্মরণ করো বা আরো বেশী (সুরা বাকারাহ-আয়াত নং ২০০)

● এবং (মীনায় অবস্থানে) দিনে (যাহা) গণনার (কয়েকদিন মাত্র) আল্লাহকে স্মরণ করো যদি কেহ তাড়াতাড়ি করে (এবং) দুদিন (রওনা হয়) তার উপর কোন গোনাহ নেই, এবং যে অপেক্ষা করে তার উপরও কোন গোনাহ নেই। (সুরা বাকারাহ) এই জন্য মীনায় খুব বেশী ইবাদত করা উচিৎ। কিন্তু সাধারনত লোক ওখানে ভ্রমণ, তর্ক-বিতর্ক ও বেকার আলোচনায় সময় নষ্ট করে থাকেন।

(৩) মীনায় তিনটি কারনে জামাতে নামাজ পড়া জটিল হয়ে ওঠে।

১। নামাজের সময়ের প্রতি লোকের মতভেদ—

২। মসলকের সমস্যা ৩। কসর নামাজের সমস্যা

জামাতে নামাজ পড়া নবীজীর সুন্নত। এই জন্য জামাতে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন ও উল্লেখিত তিন কারনে বাধা সৃষ্টি করবেন না।

(৪) মীনার তাঁবুতে পৌঁছেই সর্বপ্রথম পর্দার ব্যবস্থা করবেন। পুনরায় সকলকে একত্রিত করে জামাত সহ নামাজের চেষ্টা করবেন ও এমন লোককে ইমাম বানাবেন যার পিছনে অন্য মসলকের লোক নামাজ পড়তে দ্বিধাবোধ না করে। (যারা দ্বিধাবোধ করবেন তারা পরে নীরবে নামাজ পুনরায় পড়ে নেবেন কিন্তু জামাতে নামাজ পড়া নবীর সুন্নত' ছাড়বেন না)

(৫) যেহেতু আল্লাহতায়ালা বলেন, মীনায় তোমরা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো এইজন্য ধর্মীয় সীমায় থেকে বেশী করে ইবাদতের চেষ্টা করা উচিৎ। এই জন্য স্থানীয় লোককে ইমাম বানানোর চেষ্টা করবেন এতে ঐ সমস্ত হাজ্বী যারা স্থানীয়, যাদের উপর কসর নামাজ জরুরী নয় তারা ইমামের সঙ্গে চার রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ পাবেন। যারা মুশাফির হওয়া সত্ত্বেও ২ রাকাত অধিক পড়বেন তারা অতিরিক্ত সওয়াব পেয়ে যাবেন। যদি সকলেই মুসাফির হন তাহলে মুসাফির ইমাম নির্বাচন করে কসর নামাজ (দুই রাকাত) পড়া উত্তম।

৬। ফরজ নামাজ ছাড়া নফল নামাজ বেশী করে পড়ার চেষ্টা করুন কিম্বা কমপক্ষে নামাজের জায়গায় বসে ১৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট তসবীহ পড়তে থাকুন। এতে অন্য লোকের ইবাদত করার উদ্দিপনা সৃষ্টি হবে। যদি আপনি সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়ে নিজের জায়গা থেকে উঠে যান তাহলে যেহেতু তাঁবুতে আরামের জায়গাতেই নামাজ করা হয় এই ভয়ে যে অন্য লোকের অসুবিধা হবে প্রত্যেকেই সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়ে খালি করতে চেষ্টা করবে। এই জন্য লোকের সুবিধা অনুযায়ী পূর্ণ নামাজ পড়ার জন্য চেষ্টা করুন ও নফল নামাজ সহ তসবীহ ইত্যাদির জন্য অভ্যস্ত হোন।

(৭) দুইজন ইমাম ও দুইজন মুআজ্জিন নির্ণয় করুন যাতে একের অনুপস্থিতিতে অন্যজন নামাজ পড়ান ও আজান দেন। নামাজের সময়তালিকা কাগজে লিখে তাঁবুতে ঝুলিয়ে দেবেন যাতে সকলের স্মরণ থাকে।

আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার তৌফিক দেন। ইমান মজবুত করুন ও ইহকাল ও পরকালে কৃতকার্য করুন। (আমীন)

● যদি কেউ নিজ বাড়ি থেকে ৭৮ কিলোমিটার দুরের সফরের এরাদা করেন তাহলে ঐ ব্যক্তি নিজের শহর ছাড়ার সাথে সাথেই মুসাফির বলে গন্য হবেন।

● যদি ঐ ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ১৫ দিনের কম অবস্থান করার এরাদা করেন তাহলে ঐ শহরে উনি মুসাফির হয়ে থাকবেন। যদি ১৫ দিনের উর্দ্ধে এরাদা করেন তাহলে পথে মুসাফির থাকবেন, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে মুকীম (স্থায়ী) হয়ে যাবেন।

● মুসাফিরের জন্য চার রাকাত ফরজ নামাজ দুই রাকাত হয়ে যায়। যাকে কসর বলা হয়।

● মুসাফির যদি সুন্নত ও নফল না পড়ে তার উপর গোনাহ নেই কিন্তু যদি পড়ে থাকে তাহলে তাকে সুন্নত ও নফলের সাওয়াব দেওয়া হয়। (সাওয়াব কম হবে না)

● মুসাফিরের জন্য ফরজ নামাজ ছাড়া ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ও ইশার তিন রাকাত বিতির পড়া বাঞ্ছনীয়।

● মুসাফির যদি মাকামী ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ পড়েন তাহলে তার নামাজ বিনা মকরুহে গৃহীত হয়। সেহেতু তাকে ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে।

● মাকামী লোক যদি মুসাফিব ইমামের পিছনে নামাজ পড়েন তাহলে তাদেরও নামাজ গৃহীত হবে, তবে ইমাম দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন। মাকামী সালাম না ফিরে উঠে বাকি ২ রাকাত পূর্ণ করবেন।

● মুসাফির অবস্থায় যখন একাকি নামাজ পড়বেন ইমাম আবু হানিফার মত অনুযায়ী তাঁকে কসর (অর্ধেক) নামাজ পড়া জরুরী তবে অন্য ইমামের মতে কসর অনুমতি আছে—জরুরী নয়।

● সৌদি আলেমদের মসলক ইমাম হাম্বলী অনুযায়ী। এই জন্য সৌদিতে সব নামাজ হানাফী মসলকের পূর্বেই পড়া হয়। যেকোন মসজিদে হাম্বলী ওয়াক্ত অনুযায়ী যদি আপনি জামাতে নামাজ পড়েন তাহলে আপনার নামাজ শুদ্ধ হবে। তবে যদি আপনি একা নামাজ পড়েন বা মীনায় সকল হাজ্বী হানাফী মসলকের হয় ও নিজেদের পৃথক জামাত করে নামাজ পড়েন তাহলে হানাফী মসলকের ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়া উচিৎ ।

মীনা ও মুজদালফা মক্কা শহরে গণ্য করা হয়েছে। এইজন্য মীনা ও মক্কার অবস্থান মোট ১৫ দিনের উর্দ্ধে হয় তাহলে হাজী মুকিম হবে ও তাকে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে।

মসলকের প্রশ্ন

কিতাবে উল্লেখ আছে বনী ইস্রাইল গোত্রে এক বোজর্গ ছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া চান—হে প্রভু তুমি আমায় বাস্তব চিন্তা থেকে মুক্ত রাখো যাতে আমি দিবারাত্রি তোমার ইবাদাতে মগ্ন থাকতে পারি। আল্লাহপাক তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাঁকে এক দ্বীপে পৌঁছান, একটি ডালিম গাছ সৃষ্টি করেন, একটি ঝরণা প্রবাহিত করেন। ঐ বোজর্গ প্রতিদিন একটি ডালিম খেতেন। ঝরণার পানি পান করতেন ও দিবারাত্রি আল্লাহর উপাসনায় মগ্ন থাকতেন।

তিনি পাঁচশত বৎসর গোনাহ না করে ধারাবাহিক ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর যখন ফেরেস্তারা তাঁকে আল্লার সম্মুখে উপস্থিত করলেন, আল্লাহতায়ালা বলেন, যাও আমি তোমায় নিজ মেহেরবানীতে ক্ষমা করলাম।

বোজর্গকে বড় আশ্চর্য লাগল ও তার অন্তরে খেয়াল এলো যে আমার ক্ষমার কারন তো আমার পাঁচশত বৎসরের ইবাদত। আল্লাহতায়ালা নিজ মেহেরবানীতে কিভাবে ক্ষমা করলেন?—

আল্লাহতায়ালা তো অন্তরযামী। ফেরেস্তাদিগকে আদেশ দিলেন, উনাকে জান্নাতে নিয়ে যাও কিন্তু হাঁটিয়ে।

জান্নাতের রাস্তা জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করে। পুল সিরাত যা জাহান্নামের উপরে আছে সকলকে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ঐ পুলের উপর দিয়ে বিদ্যুতগতিতে পার হয়ে যান কিন্তু যারা অসৎ তাদের জন্য বড়ই সমস্যা।

যখন ফেরেস্তারা বানী ইস্রাইলের ঐ বোজর্গকে পাঠাচ্ছিলেন, জাহান্নাম যত নিকটে আসছিল তাপের মাত্রা বাড়তে লাগলো। বোজর্গের পিপাসা লাগল ও পিপাসায় কাতর হয়ে গলা শুকিয়ে এলো, সহ্যের বাইরে হয়ে গেল। ঐ সময় একটি হাত দেখা গেল, ঐ হাতে একগ্লাস পানি ছিল। তিনি ঐ বোজর্গকে বললেন এই পানিটা কিনতে চাও তো নিয়ে নাও। বোজর্গের পিপাসায় প্রাণ যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন কি মূল্যে দেবে? উত্তর এলো পাঁচশত বৎসরের ইবাদতের পরিবর্তে। বোজর্গের কাছে পাঁচশত বৎসরের ইবাদত তো স্টকেই ছিল, শীঘ্র ইবাদত দিয়ে পানি নেন ও পান করেন।

যখন ফেরেস্তারা নেকির অংশ খালি দেখলেন জান্নাতের সফর থেকে থেমে গেলেন ও পুনরায় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি তোমায় পার্থিব দুনিয়ার চিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছিলাম। পাঁচশত বৎসর দিনরাত্রি তোমার আহারের ও পানির ব্যবস্থা করেছিলাম। তোমার সর্বপ্রকারের প্রয়োজন পূর্ণ করেছিলাম। তুমি এককুল্লি পানির মূল্য পাঁচশত বৎসরের ইবাদতের বিনিময়ে করলে? এখন আমি তোমার উপরে পাঁচশত বৎসর যে অনুদান করেছি ও অনুগ্রহ তোমার উপর বর্ষন করেছি তুমি তার কি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছো তার হিসাব দাও।

বানী ইস্রায়েলের বোজর্গ সেজদায় মাথা অর্পন করেন। তোওবা করেন ও বলেন, হে আল্লাহ নিঃসন্দেহে তুমি যার উপর মেহেরবানী করো ও ক্ষমা করো কেবল সেই জান্নাতবাসী হতে পারে।

হজরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা যদি আমায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন তাহলে সেটা তাঁর ইনসাফ। আর যদি আমায় জান্নাতবাসী করেন তাহলে সেটা তাঁর অনুদান।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন,

অর্থাৎ— তোমাদের কেহ কোন আমল (কর্ম) দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারো না বরং আল্লাহতায়ালার অনুদানে পরিত্রাণ পেয়ে থাকবে।

নামাজের জন্য পবিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি সামান্য নাপাক কাপড়ে বা শরীরে লেগে থাকে তাহলে নামাজ শুদ্ধ হয়না। আপনি অপবিত্র অবস্থায় আছেন। অপবিত্র আপনার কাপড়ে লেগে থাকে ও পানি না পেয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহতায়ালার আদেশ তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ো। (সুরা নিসা-৪৩)

তায়াম্মুমে মাটির উপর হাত ঘসে মুখমন্ডলে মাখতে হয়। শুধু মাটিতে হাত ঘসে মুখে মেখে নিলে পবিত্র হয়ে যায়? না, এটা একটা বিধানমাত্র। আসলে আল্লাহপাক আপনার এরাদা, আপনার সততা, আপনার চেষ্টা দেখেন। আর এই জন্যই আমাদের এমন ইবাদত যেগুলো গ্রহণের যোগ্য নয় তবুও আল্লাহপাক গ্রহণ করেন। আল্লাহতায়ালা সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এর মালিক। তাঁর কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর কাউকে তাঁর কর্মের হিসাবও দিতে হবে না। তিনি যেমন চান তেমন করেন।

● ঐ আলেম যিনি সারা দুনিয়াবাসীর ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখেন ও নিজ মসলক ছাড়া অন্য মসলককে ভ্রান্ত বলে থাকেন। তাঁকে গিয়ে বলুন হুজুর আপনি পবিত্র হয়ে যান ও ক্বাবাগৃহে পূর্ণ একাগ্রতার সহিত নামাজ পড়ুন ও গ্যারান্টি দিয়ে বলুন যে, আল্লাহতায়ালা আপনার ঐ নামাজকে গ্রহণ করবেন? যে মানুষ নিজের ইবাদতের গ্যারান্টি দিতে পারে না সে অপরের ইবাদতের কি গ্যারান্টি দেবে, যে আল্লাহতায়ালা তার ইবাদত গ্রহণ করবে না।

আববাসী খেলাফতে শিয়া ও সুন্নীদের মতভেদ এতে বেড়ে গিয়েছিলো যার কারণে খেলাফত (রাজত্ব) সমাপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ওখানের ভিক্ষুক ও ফকিরদের আমদানী খুব বেড়ে গেল। ভিখারীদের একটি দল দাজলা দরিয়ার পুলের এক অংশে বসতো এবং ওদের অন্য একটি দল পুলের অন্য অংশে বসতো। এই পুলটি (ব্রিজ) শহরের মাঝে ছিলো। একটি দল হজরত আলী (রাঃ) ও তার পরিবারের গুণগান বর্ণনা করত। দ্বিতীয় দল হজরত আবু বকর (রাঃ) ও হজরত উমরের (রাঃ) গুণগানের কবিতা আবৃত্তি করত। শিয়া ও সুন্নী যারা অতিক্রম করতেন দুটি দলকে খুব সাহায্য করতেন। টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো। এইভাবে ভিখারীদের দুটি দল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু টাকা একত্রিত করে নিত ও রাত্রিতে দুটি দল একত্রিত হয়ে টাকা বন্টন করে নিত।

মুসলমানদের নিজেদের মতভেদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কেবল বাগদাদের ভিখারীই ছিলনা বরং আজও সেই পদ্ধতিতে উপকৃত হতে বেরেলি, দেওবন্দী ও আহলে হাদীস, শিয়া, সুন্নী এবং মুসলমানদের অন্য মতভেদী ধারনা থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন।

এইজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে এদের থেকে সাবধানে থাকবেন ও এদের মতভেদী কথার উপর লক্ষ্য দেবেন না। কেননা এরা নিজের ব্যক্তিগত সম্মান, খ্যাতি ও উপকারের জন্য একে অপরের সঙ্গে লড়িয়ে থাকেন।

● বাধ্যতা অবস্থায় অপবিত্র লেগে থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে নামাজ পড়া যায়। এই রকম বাধ্যতায় হজ্ব যাত্রায় আপনাকে সম্মুখীন হতে হবে। আপনি বাধ্য, আপনি হারাম শরীফের ইমামকে পরিবর্তন করতে পারবেন না ও তাঁর মসলককেও পরিবর্তন করতে পারবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) বলেছেন যে, নামাজ জামাত সহ মসজিদে পড়ো। আজান শ্রবণ করার পর বিনা অজুহাতে বাড়িতে নামাজ শুদ্ধ হয় না। এইজন্য আল্লাহর এই আদেশকে মান্য করে হারাম শরীফে জামাত সহ নামাজ পড়বেন। আল্লাহতায়ালা আপনার প্রচেষ্টা, এরাদা, সততা দেখেন। ইনশা আল্লাহ যা গ্রহণ করার অযোগ্য হবে তাও গ্রহণ করবেন। আমিন। স্বভাবতঃ আল্লাহতায়ালা আন্তরিকতা দেখেন ও নিজ মেহেরবানীতে ক্ষমা করেন।

● আপনি ঘৃণার বশীভূত হয়ে, একলা বা পৃথক জামাতে নামাজ পড়ে থাকেন। যদি বানী ইস্রাইলের বোজর্গ ৫ শত বৎসর ইবাদতের বিনিময়ে জান্নাত অর্জন করতে না পারেন তাহলে আপনি নিজ ধারনায় শুদ্ধ ইমামের পিছনে বা একাকী কেবল কয়েক বৎসরের ইবাদতের বিনিময়ে জান্নাত কিভাবে অর্জন করবেন?

● মাননীয় বন্ধুগণ, হারাম শরীফে এক নামাজের সওয়াব একলক্ষগুণ বেশী হয়। আর ঐ নামাজ যদি জামাতসহ পড়া হয় তাহলে ২৭ লক্ষ গুন সওয়াব বেশী হয়।

এইজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্বের পবিত্র যাত্রায় মসলকের মতভেদের বাইরে আসুন ও চেষ্টা করুন আপনি প্রতি নামাজ হারাম শরীফে পড়বেন ও জামাত সহ পড়বেন।

যদি (বাতিল) উলামাদের বক্তৃতা শুনে আপনার অন্তরে হারাম শরীফের ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে অপছন্দ হয় তাহলে আপনি পুনরায় নামাজ পড়ে নিন। কিন্তু জামাতে নামাজ পড়ে ২৭ লক্ষ গুন সওয়াব অবশ্যই অর্জন করুন নচেৎ এটা আপনার জীবনে একটা বড় ব্যর্থতা।

আল্লাহতায়ালা আপনার প্রত্যেক ইবাদতকে গ্রহন করুন। আপনার প্রতিটি নেক ও শুদ্ধ কামনাকে কবুল করুন ও হজ্বে মবরুরের তৌফিক দিন। আমীন।

আমরাও কি মুসলমান?

হজরত হাসান বাসরী উচ্চস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন। যিনি বড় বড় সাহাবাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ঐ যুগেই ছিলেন যখন পদে পদে মুহাদ্দেসিন, ইমাম, উলামা ও নেক লোক বর্ত্তমান ছিলেন।

একদিন কেউ জিজ্ঞাসা করেন— হুজুর, সাহাবাগণ কেমন ছিলেন? বলেন, যদি তোমরা তাঁদেরকে দেখতে তাহলে বলতে এরা পাগল। আর যদি তাঁরা তোমাদেরকে দেখতেন তাহলে বলতেন ইসলামের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

জামাতের গুরুত্ব

হজরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি চান যে, সে কেয়ামতের দিনে আল্লাহতায়ালার সামনে একজন মুসলমানের রূপে উপস্থিত হবেন। তার উচিৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঐ মসজিদে পড়া যেখানে আজান দেওয়া হয়। কিম্বা জামাত আদায় করে। আল্লাহতায়ালা তোমাদের নবীকে যে সঠিক পন্থা দিয়েছেন তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহ পড়ার আদেশ আছে। যদি আপনি আপনার বাড়ীতে পড়ে নেন যেমন পিছনে থাকা লোক নিজের বাড়িতে পড়ে থাকেন। তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমার নবীর সুন্নতের অবহেলা করলে। যদি তোমরা নবীর সুন্নতের অবহেলা করে থাকো তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো। আমি কোন সাহাবীকে জামাতে অনুপস্থিত থাকতে দেখিনি। জামাত হইতে ঐ ব্যক্তিই অনুপস্থিত থাকতো যে প্রকাশ্য মুনাফেক হতো, অসুস্থরাও দুই জনের সাহায্যে নামাজের লাইনে উপস্থিত হয়ে যেতেন।

কুরবানীতে ধোকা

হজ্ব একটি মহান ইবাদত। বহুলোক হাজ্বীদের সেবার জন্য উৎসাহিত হয়ে পানি পান করান। খাবারও বিতরণ করেন। মীনা ও আরাফাতে ব্যবহারের বস্তু হাজ্বীদের উপহার দিয়ে থাকেন।

এই রকমই একটি দল সেবার জন্য ১০ই জিলহজ্ব কুরবানী করানোর জন্য আপনার সেবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবেন ও বলবেন প্রতি বৎসর একশত, দুইশত বা আরো অধিক হাজ্বীদের জন্য আমরা কুরবানী করিয়ে থাকি। যদি আপনি চান আপনারও কুরবানী করিয়ে আপনার সাহায্য করতে চাইবে। এই রকম আপনার বিল্ডিং-এর মালিকও আপনার কুরবানীর জন্য সেবা করতে চাইবে। সাবধান, এই সাদা পোশাকধারীরা আপনার সাহায্যকারী নয় বরং এরা ধোকাবাজ।

প্রতি হাজ্বী মক্কায় নতুন থাকেন। ১০ই জিলহজ্ব কুরবানীর দিন অনেক কাজ থাকে। লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে জবেহস্থলে গিয়ে কুরবানী করার হিম্মত প্রতি হাজীর থাকে না। এহরাম খোলার তাড়াতাড়ি থাকে। এই জন্য প্রতি হাজী সংক্ষেপে কাজ করতে চায় ও দালালকে টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়। কিন্তু এটা একটা বড় ভুল।

আমি ও আমার কয়েকজন সাথী হজ্বের তিনদিন পূর্বে কা'কয়ী জবেহস্থলে গিয়ে কুরবানীর পশু বিক্রয়কারীদের কাছ থেকে পশুর মূল্য, দালালদের মাধ্যমে কুরবাণী করা, জবেহস্থলে কুরবানীর পদ্ধতি ও কুরবানীর গোস্ত কিভাবে বন্টন করা হয় ইত্যাদি খুব সূক্ষ্মভাবে যাচাই করেছি। তাতে আমরা সন্ধান পেলাম—

১) প্রতি দালালের সঙ্গে পশুবিক্রয়কারীর একটা ব্যবসায়ীক সম্পর্ক থাকে। যদিও হাজীদের কাছ থেকে ৩০০ বা ৩২৫ রিয়াল নিয়ে থাকে ঐরকম পশু ক্রয় করে যার মূল্য ২৭০ বা ২৮০ রিয়াল হবে।

২) সে পশুবিক্রয়কারীর কাছ থেকে কমিশন আদায় করবে।

৩) যদি ১০০ কুরবানীর জন্য টাকা নিয়ে থাকে তাহলে ৭০ বা ৮০টি কুরবানী করবে।

৪) কুরবানীর এক-তৃতীয়াংশ গোশ গরীবদেরকে বণ্টন করতে হয়। কিন্তু হাজী যদি ছেড়ে দিয়ে থাকেন তাহলে দালাল পূর্ণ গোশ হোটেলে বিক্রয় করে থাকে।

৫) কুরবানী করার সময় কোন হাজীর নাম নেওয়া হয় না।

আমরা যাচাই করছিলাম, এদিকে ঐ সময় পর্যন্ত হাজীরা কোন না কোন দালালকে টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে বেশ কিছু হাজী দালালের কাছ থেকে টাকা ফেরৎ নেন। যারা ফেরৎ নিতে পারেননি আন্তরিক তৃপ্তির জন্য পুনরায় কুরবানী করেন।

● মক্কা শরীফে দুটি জবেহস্থল আছে। একটি মীনা ও মুযদালফার মাঝে যা মীনার নিকটে। সেখানে আপনি হেঁটেও যেতে পারেন। দ্বিতীয়টি কা'কয়ীতে আছে। মীনা ও কা'কয়ীতে মাঝে পাহাড় থাকার জন্যে আপনাকে মক্কা হয়ে যেতে হবে। এর দূরত্ব মক্কা থেকে ৫ কিলোমিটার হবে। ট্যাক্সিওয়ালা ২ রিয়াল ভাড়া নেয় ও প্রাইভেট ট্যাক্সিওয়ালা ১০ রিয়াল ভাড়া নিয়ে থাকে।

● কা'কয়ীতে কুরবানীর ভালো ব্যবস্থা আছে। সেখানে ছাগল, দুম্বা, গরু ও উট ইত্যাদি আপনার শক্তি অনুযায়ী ক্রয় করতে পারেন। পশু ক্রয় করে আপনি জবেহস্থলে জমা করে দিন। ছাগল কুরবানীর জন্য ৩০ রিয়াল, গাভীর জন্য ১৫০ রিয়াল ও উটের জন্য ২৫০ রিয়াল নেবেন। কুরবানী সরকারী লোকই করবে তবে আপনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন। পশু জমা করার পর আপনাকে ১টা কুপন দেওয়া হবে। সেটা দেখিয়ে কুরবানীর পূর্ণ গোশ নিতে পারেন নচেৎ সরকার গরীব দেশে বন্টন করে দেয়।

● মীনার জবেহস্থলেও উট, বলদ ও গাভীর কুরবানীর ঐ রকমই ব্যবস্থা আছে।

● ২য় সহজ পদ্ধতি আপনি কুরবানীর টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়ে দিন। এটাও শুদ্ধ পদ্ধতি। ব্যাঙ্কে টাকা জমা করায় কোন অসুবিধা নেই। কেননা কুরবানীর দায়িত্ব সরকার নেয়। সরকার হাজীদের সেবা মন-প্রাণ দিয়ে করে থাকেন। কোনপ্রকার অভিযোগ থাকে না।

● যদি লোকের ভীড়, অল্প সময়, হারিয়ে যাওয়ার ভয়, বা দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে আপনি নিজে কুরবানী করতে না পারেন তাহলে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা জবেহস্থলে কুপন নিয়ে কুরবানী করে দিন। নচেৎ কুরবানীস্থলে গিয়ে কুরবানী করে দিন যেটা সবচেয়ে উত্তম । কিন্তু সব সময় দালাল থেকে সাবধান থাকবেন।

● মক্কা শরীফে হারামের বাইরে মাদ্রাসা সৌলতিয়া আছে। কয়েক বৎসর থেকে হাজীদের সেবা করে আসছেন। এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই মাদ্রাসা ফাহাদ গেটের নিকট হুরাতুল গেটের এরিয়ায় বাচ্চা মেয়েদের কবরস্থানের নিকট। যদি আপনি এই মাদ্রাসার মাধ্যমে কুরবানী করেন শুদ্ধ হবে। তারা আপনার বলা সময় অনুযায়ীই কুরবানী করবেন। যদি আপনার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে দুটো তিনটে পর্যন্ত শয়তানকে পাথর মারার কাজ পূর্ণ করে নেবো তাহলে সাবধানতা স্বরূপ আপনি কুরবানীর সময় চারটেয় বলবেন ও সাড়ে চারটের সময় মাথা ন্যাড়া করিয়ে এহরাম খুলে দেবেন। এইভাবে আপনার হজ্বের কর্ম শুদ্ধ পদ্ধতিতে করা সম্ভব হবে (ইনশাআল্লাহ)।

জামারাত ও প্রাণের ভয়

● মীনা ঐ পল্লী যেখান দিয়ে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) হজরত ইসমাইল (আঃ)-কে নিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। তিনটি জামারত ঐ স্থান যেখানে শয়তান তাঁদেরকে প্রবঞ্চনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। উত্তরে তার উপর ধিক্কার দেওয়া হয়েছিলো। শয়তান তখনও লাঞ্ছিত হয়েছিলো। হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নত বজায় রেখে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে আজও তাকে লাঞ্ছিত করা হয়।

● যে স্থানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন ঐ স্থানে চিহ্নস্বরূপ স্তম্ভ তৈরি করা আছে। ঐ স্তম্ভে শয়তান নেই। ঐ স্তম্ভে পাথর মারা জরুরী নয়। আসল পাথর মারার স্থান ঐ স্তম্ভের ভিত্তি বা গোড়ায়। এইজন্য আপনার পাথর স্তম্ভের গোড়ায় পড়া উচিত। যদি আপনি এতদূর থেকে পাথর মারেন যে স্তম্ভে লেগে গোড়ার সীমার বাইরে চলে যায় তাহলে আপনার ঐ পাথর নিক্ষেপ বিফল হয়ে যাবে। ঐ পাথর গণ্য হবে না। ওর পরিবর্তে অন্য একটি পাথর আপনাকে মারতে হবে। যদি আপনি তার পরিবর্তে অন্য পাথর না মেরে থাকেন তাহলে আপনার রমির (পাথর নিক্ষেপের) কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার সাজাস্বরূপ আপনাকে দম (কুরবানী) দিতে হবে। এই মসয়ালাগুলি আলেমদের কাছ থেকে ভালোভাবে জেনে নেবেন।

● ১০ই জিলহজ্ব-এ পাথর মারার উত্তম সময় এশরাক থেকে জওয়াল পর্যন্ত। ১১, ১২, ও ১৩ তারিখে পাথর মারার সময় জওয়ালের পর।

ঐ উত্তম সময়ের পর পুরুষদের জন্য জায়েজ (শুদ্ধ) সময় (এমন সময় যখন পাথর মারা বিনা মকরূহে শুদ্ধ ও কোন গোনাহ নেই) চার দিনে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। শুদ্ধ সময়ের পর পুরুষদের জন্য শুদ্ধ কিন্তু মকরূহ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সুবহে সাদেক (ফজরের পূর্ব) পর্যন্ত। স্ত্রী, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের জন্য বিনা মকরূহে সুবহে সাদেক পর্যন্ত শুদ্ধ। বোখারী শরীফে হাদীস নং ৭৯৮, বর্ণনাকারী হজরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)।

হাজী সাহেবদের সংখ্যা ও প্রতি বৎসর যে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরাম পুরুষদের জন্য সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ সময়ে পাথর নিক্ষেপ করার পরামর্শ দিয়েছেন। স্ত্রী, বৃদ্ধ ও দুর্বল লোকেরা সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই পাথর নিক্ষেপ করবেন, তাতে বিপদে পড়া থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে আরম্ভ করা সুন্নত। কিন্তু ভীড়ের কারণে হুজুর (দঃ) দূর থেকে চুম্বন দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আজ সকল হাজী দূর থেকে হাজরে আসওয়াদকে ইসতেলাম (চুম্বন) করেন।

ঐ রকম যখন হুজুর (দঃ) উত্তম সময়ের পর সহজের জন্য পাথর মারার অনুমতি দিয়েছেন তাহলে জেনেশুনে উত্তম সময়ে পাথর মারার জন্য নিজেকে বিপদের মুখে না ফেলা দরকার। এই বিপদ একগুঁয়ে প্রকৃতির লোকই জেনেশুনে নিয়ে থাকেন। আপনি যদি রাত্রি দুটোয় পাথর মারার জন্য যান শতাধিক ব্যক্তিকে পাথর মারতে দেখতে পাবেন।

● পাথর নিক্ষেপের জন্য মুজদালফা থেকে সত্তরের কিছু বেশী পাথর নিয়ে নেবেন। পাথর খেজুরের আঁটি সমতুল্য হওয়া উচিত। তবে পাথরগুলি ধোয়া জরুরী নয়। তবে যদি অপবিত্র হওয়ার সন্দেহ থাকে তাহলে ধোয়া উত্তম।

● পাথর মারার পূর্বে সকল সাথী একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে নেবেন যে, যদি ভীড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাই তাহলে পাথর মেরে অমুক স্থানে একত্রিত হবো।

পাথর মারতে যাওয়ার পূর্বে নিজের এহরামের চাদরটি ভালোভাবে জড়িয়ে নেবেন। কোন ব্যাগ ইত্যাদি সঙ্গে নেবেন না। এমন কোন কাপড় পরবেন না যাতে অপরের পায়ের নিচে জড়ানোর আশঙ্কা থাকে। ভীড়ের জন্য যদি চাদর, উড়না বা ব্যাগ কারো পায়ের নীচে পড়ে যায় তাহলে আপনিও পৃথক করে দিন। ঝুঁকে বা বসে কোন জিনিস তোলার চেষ্টা মোটেই করবেন না। নচেৎ ভীড়ে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

● ১০ তারিখে কেবল বড় শয়তানকে ৭টি পাথর মারতে হবে। ২য়, ৩য় ও প্রয়োজনে ৪র্থ দিন তিনটি শয়তানকে ৭টি করে পাথর মারতে হয়। ১০ তারিখে তালবিয়া (লাববাইক) পড়া যা আপনি এহরাম পরার সঙ্গে আরম্ভ করেছিলেন তা বন্ধ হয়ে যায়।

বড় শয়তানকে নির্দিষ্ট একদিক থেকে পাথর মারতে হয়। পাথর মারার সময় মক্কা শরীফ আপনার বামদিকে ও মীনা ডানদিকে থাকবে। মাটির উপর ঐ শয়তানের পরিধির দেওয়াল সাবধানতা ও বোঝানোর জন্য অর্ধেক পরিধির আকৃতিতে আছে। বাকি দুটি শয়তানকে চতুর্দিক থেকে পাথর মারতে পারেন। তাদের গোড়ার দেওয়ালের পরিধি পূর্ণ আকারে আছে।

পাথর সর্বদা ব্রিজে চড়ে মারবেন। খোলা হাওয়ায় শ্বাস বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। ব্রীজের উপর লোক একদিক থেকে প্রবেশ করে ও অপরদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। নীচে মাটির উপর থেকে অনিয়মিত রাস্তায় তাঁবু বানিয়ে থাকে ও আসবাবপত্র রেখে আরাম করতে থাকে। এইজন্য জায়গা কম

হয়ে যায় ও শয়তানের দিকে লোক চতুর্দিক থেকে আসার চেষ্টা করে। লোকের একদিকে চলার গতি রুখে যায়, ফলে ঠেলাঠেলি ও দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়ে যায়।

● যখন শয়তানের নিকট পৌঁছাবেন ডান ও বামদিক করে একটু আগে এগিয়ে যাবেন। পুনরায় ফিরে শেষদিক থেকে পাথর মারবেন। কেননা যোশভরা লোক শয়তানের নিকট পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই পাথর মারতে থাকে। এইজন্য প্রথম দিকে খুব বিশৃঙ্খলা হয়ে থাকে।

● পাথর মারার সময় একবার একটিই পাথর মারবেন। মারার পূর্বে এই দোয়া পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِلرَّحْمٰنِ
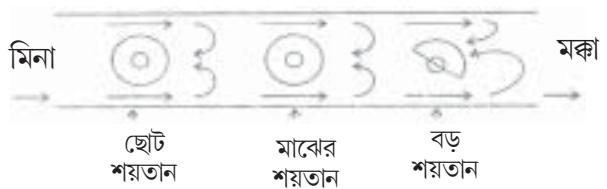
অর্থ ঃ—আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্ব উচ্চ। এই পাথর শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্য ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মারছি।

পুনরায় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার...... পড়ে পাথর মারবেন। লিখিত দোয়ায় যদি শব্দের পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এইজন্য উত্তম আপনি মুখে বলবেন আমি শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্য ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাথর মারছি ও বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে পাথর মারবেন। পাথর পরিধির মধ্যে পড়া জরুরী। একবারে একটিই পাথর মারবেন। যদি একসঙ্গে একের অধিক পাথর মেরে থাকেন একটিই গণ্য হবে।

● ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দিনে প্রথমে ছোট শয়তানকে তারপর মাঝের শয়তান ও পুনরায় বড় শয়তানকে ৭টি করে পাথর মারতে হয়। ছোট ও মাঝের শয়তানের স্থান দোয়া কবুল হওয়ার স্থান। এইজন্য এ দুটির কাছে পাথর মারার পর ক্বাবা শরীফের দিকে মুখ করে খুব দোয়া চান। বড় শয়তানকে পাথর মারার পর দোয়া চাইবেন না।
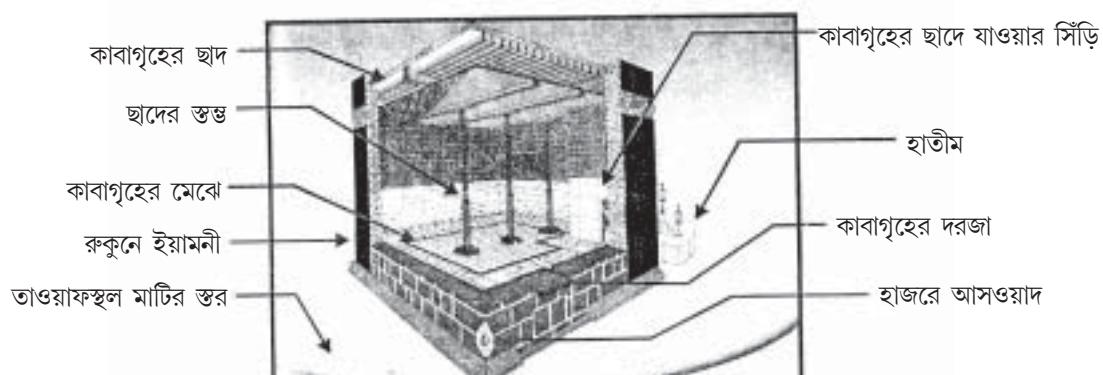
● অনেক সুস্থ সবল লোক নিজে পাথর না মেরে অন্য লোককে প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। এ পদ্ধতি ঠিক নয়। এতে হজ্বের কর্ম পূর্ণ হবে না। প্রতিনিধির মাধ্যমে তারই পাথর মারা শুদ্ধ হবে যে শরীয়ত অনুযায়ী দুর্বল। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন ও চলাফেরা করতে পারেন তাকে স্বয়ং পাথর মারতে হবে।

● হজ্বের ৪ দিনে ৪০ লক্ষ মানুষ ৪৯ থেকে ৭০টি করে পাথর নিক্ষেপ করে থাকেন। যদি একই জায়গায় এত পাথর একত্রিত করা হয় তাহলে পাথরের পাহাড় হয়ে যাবে। কিন্তু জামারাতের (শয়তানের) কাছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন পাথরের কোন রাশি জমে না। কেননা আল্লাহর মনোনীত পাথর ফেরেস্তারা নির্বাচন করে নিয়ে যায়। কেবল বড় শয়তানের একদিকে পাথরের রাশি দেখতে পাবেন। কেননা বড় শয়তানকে পাথর মারার সময় মক্কা শরীফ আপনার বামদিকে ও মীনা ডানদিকে হওয়া দরকার। ওর অন্যদিকে পাথর মারা শুদ্ধ নয়। অন্যদিকে পাথর মারা গ্রহণ করা হয় না, ফেরেস্তারাও তুলে নিয়ে যায় না। এইজন্য এখানে আপনি পাথরের রাশি দেখতে পাবেন।

আপনি এই অলৌকিকতাকে দর্শন করে নিজের ইমানকে সবল করুন।

কাবাগৃহের ভিতরের ছবি

এহরামের বর্ণনা

★ এহরাম —হজ্ব ও উমরার ইউনিফরম (বিশেষ পোশাক)

★ হজ্বের এহরাম প্রথম শওয়াল থেকে ১০ই জিলহজ্ব পর্যন্ত পরিধান করতে পারেন। উমরার এহরামে হজ্বের পাঁচদিন ব্যতীত যেকোন সময় পরিধান করতে পারেন।

মীকাত (সীমারেখা) থেকে এহরাম পরা ওয়াজেব।

★ পুরুষদের এহরাম ২ মিটার x ১ মিটার, বিনা সেলাইয়ে ২টি চাদর, ১টি পরার জন্য ও অন্যটি শরীরে জড়ানোর জন্য।

বিনা সেলাইয়ের অর্থ এতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন অনুযায়ী কোন জিনিস সেলাই না করা যেমন হাত, পকেট ইত্যাদি। বিনা সিলাইয়ের এ অর্থ নয় যে ওতে সুই সুতো না লাগে। প্রয়োজনে আপনি চাদরের পরিবর্তে কাঁথা বা লেপ ইত্যাদি মুড়ি দিতে পারেন যেটা কয়েকটি চাদরকে একত্রিত করে সিলাই করা থাকে।

★ এহরামের চাদর সাদা হলে উত্তম হয়। কোন অসুবিধা থাকলে রঙ্গিন চাদরও ব্যবহার করতে পারেন।

★ এহরাম পরিধানের পর, পূর্ব থেকে যে নিষেধাজ্ঞা আপনার উপর ছিলো যেমন কটু কথা, অসভ্য কথা, গোনাহের কথা ও ঝগড়া বা মারামারির কথা ইত্যাদি তেমনই থেকে যায়। এছাড়া আরো কিছু নিষেধাজ্ঞা আপনার উপর এসে যায়। তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

এহরামের নিষেধাজ্ঞা

(১) চুল না কাটা ও না ছেঁড়া

(২) লোম না কাটা ও না ছেঁড়া

(৩) পুরুষদের জন্য মাথা না ঢাকা। ছায়ায় বসতে পারেন, ছাতা ব্যবহার করতে পারেন, মাথায় কোন সামগ্রী রেখে চলতে পারেন। কিন্তু টুপি, রুমাল, চাদর বা অন্য কোন চিপকে থাকার বস্তু দিয়ে মাথা ঢাকতে পারবেন না।

(৪) নিজের শরীরের কাপড়ে অথবা খাদ্যে বা শরবত ইত্যাদিতে খুশবু ব্যবহার না করা।

(৫) শিকার করার স্থলের জন্তুকে শিকার না করা, না তাড়ানো আর অন্য কোন ব্যক্তিকে শিকারের জন্য সাহায্য না করা। শরীরে সৃষ্টি হওয়া কীট, উকুন ইত্যাদি না মারা , শরীরের ময়লা দূর না করা। আপনি স্নান করতে পারেন কিন্তু বিনা সাবানে ময়লা দূর না করে।

(৬) এহরামের অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন নিষিদ্ধ।

(৭) এহরামের অবস্থায় পায়ের উপরে (পাঞ্জার পিছনে) উঁচু হাড় খোলা থাকা জরুরী এইজন্য যে এমন জুতো বা চপ্পল পরবেন না যাতে টাখনা ঢেকে যায়। যদি আপনি হাওয়াই চপ্পল বা স্লিপার পরেন টাখনা খোলা থাকবে।

(৮) মেয়েদের জন্য এহরামের কোন বিশেষ বস্ত্র নেই। কিন্তু উত্তম এই যে কাপড় এমন স্বাভাবিক হয় যাতে কোন অশ্লীলতার কারণ না হয়। মেয়েরা মাথায় যে টুপি বাঁধে ও বোরকার উড়না পরে ওটা এহরামের জন্য জরুরী নয়। বরং এটা কেবল সাবধানতা যাতে মাথা না খুলে যায় ও চুল না বের হয়ে যায়। তাদেরকেও ওজুর জন্য টুপি খুলে মাথা মসেহ করা জরুরী।

(৯) এহরাম অবস্থায় মেয়েদের মুখমন্ডল ও হাতের কব্জি খোলা থাকা জরুরী। তবে না-মুহরিম পুরুষদের কাছে মুখের সামনে কিছু আড়াল করা বা পর্দা করা জরুরী।

(১০) এহরাম পরিধানের পূর্বে শরীরে খুশবু লাগিয়ে এহরাম পরা সুন্নত। কিন্তু এহরাম পরে কোনরকমের খুশবুর ব্যবহার শুদ্ধ নয়। (শরীরে খুশবু এত অল্প লাগাবেন যাতে এহরামের চাদরে তার চিহ্ন না পড়ে।)

এহরামের সুন্নত

★ গোসল করা ও এহরাম পরার পূর্বে খুশবু লাগানো।

★ একটি লুঙ্গী ও একটি শরীরে জড়ানোর চাদরের এহরাম পরা।

★ এহরামের পূর্বে নখ কাটা।

★ নামাজের পর এহরাম বাঁধা (দোওয়া পড়া)।

★ এহরামের প্রারম্ভ লাববাইক (তালবিয়া) পড়ে করা ও বার বার লাববাইক পড়া।

পুরুষ এহরাম কিভাবে পরবেন

এহরামের একটি চাদর লুঙ্গির মতো পরতে হয়। ওটা আপনি যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে পরতে পারেন। ওর জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি বা নির্দেশ নাই। কিন্তু যেহেতু হজ্বের সময় অস্বাভাবিক ভীড় হয়, লুঙ্গীর ভিতরে কোন জাঙ্গিয়া পরার অনুমতি থাকে না এইজন্য যদি লুঙ্গি খুলে যায় পূর্ণ উলঙ্গ হওয়ার ভয় থাকে। এইজন্য এহরামের লুঙ্গি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেটা খুবই সংরক্ষিত পদ্ধতি।

১. আপনি পা দুটি একটু ছড়িয়ে দাঁড়ান।

২. লুঙ্গির দুটি কোণ বাম হাতে ধরে ডানদিকে টেনে লম্বা করে দিন (ছবি নং-১)।

৩. পুনরায় ডান হাত দিয়ে ডান হাতের বগলের নীচে লুঙ্গি টি পেটের সঙ্গে চিপকে ধরে থাকবেন ও বাম হাত দিয়ে লুঙ্গি র দুটি কোণ বামদিকে পূর্ণভাবে নিয়ে আসবেন। (ছবি নং-২)

৪. পুনরায় বাম বগলের নীচে লুঙ্গিটি পেটের সাথে চিপকে ধরে থাকবেন ও লুঙ্গি পুনরায় ডানদিকে নিয়ে আসবেন। এবার লুঙ্গির বেঁচে থাকা কোণ মাঝে নাভীর কাছে শেষ হয়ে যাবে। (ছবি নং-৩)

৫. আপনি এটা জড়িয়ে নিন। লুঙ্গি আপনার নাভির উপরে

ছবি নং-৪ ছবি নং-৩

থাকবে কেননা নাভি শতরের মধ্যে (লজ্জাস্থান) গণ্য ও শতর ঢাকা জরুরী। ছবি নং-৪

৬. এহরাম কেবল দুটি চাদরকে বলা হয়। এতে কোমরের পাট্টা গণ্য নয়। কিন্তু যেহেতু হজ্বের সময় টাকা পয়সা রাখা জরুরী, এইজন্য পাট্টা পরার অনুমতি আছে।

৭. লুঙ্গি খোলার ভয়ে (যখন পাট্টা পরবেন তখন কিছু টাকা ওতে রেখে বৈধ করে নেবেন ও পরবেন) পাট্টা নাভির

ছবি নং-৯ ছবি নং-৮ ছবি নং-৭ ছবি নং-৬ ছবি নং-৫

উপরে বা নাভির সোজা পরবেন যাতে লুঙ্গির উপরের অংশে আপনার নাভি সর্বদা ঢাকা থাকে। এহরাম অবস্থায় আপনি চশমা, ঘড়ি, কানের মেশিন ইত্যাদি পরতে পারেন। আর ওজু করার সময় স্বয়ং যে চুল ওঠে ও পড়ে যায় তার উপর কোন দম দিতে হবে না।

৮. উমরাহ ও হজ্বের তাওয়াফে জিয়ারতে পুরুষদের জন্যে রমল ও ইজতেবা করা সুন্নত। ইজতেবার জন্য এহরামে চাদরটির একটি কোণ ডানহাতের বগলের নীচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাম হাতের কাঁধের উপর রেখে নিন। (ছবি নং-৫)

৯. হজ্বের চারদিনে শরীরের উপর তিন থেকে চারদিন এহরাম থাকে। এহরামের একটি চাদর লুঙ্গি স্বরূপ পরে ও পাট্টায় বেঁধে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় কিন্তু উপরের চাদরটা সামলানো বড় অসুবিধা হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ নামাজের অবস্থায়। এইজন্য বোজর্গ ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যক্তি যারা কয়েকবার হজ্ব করার অভিজ্ঞতা রাখেন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উপরের চাদরটি জড়ানোর পরামর্শ দেন ।

ছবি নং-২ ছবি নং-১

১. প্রথমে উপরের চাদরটি কাঁধের উপর পূর্ণ রেখে হাত দুটি পূর্ণ সোজা করে সামনের দিকে টেনে নিন ও চাদরের দুটি কোণ দুই হাত দিয়ে ধরে থাকুন। (ছবি নং-৬)

২. পুনরায় ডান হাতের কোণ বাম বগলের নীচে লুঙ্গি বা পাট্টার নীচে খুসে নিন। (ছবি নং-৭)

৩. পুনরায় বামহাতের কোণ ডান বগলের নীচে লুঙ্গি বা পাট্টার নীচে খুসে নিন। (ছবি নং-৮)

৪. পুনরায় এহরামের যে কাপড় যা আপনার হাতের উপর ঝুলবে উহা জামার হাতের মতো গুটিয়ে নিন। এইভাবে আপনার দুটি হাত মুক্ত হবে ও উপরের এহরামের চাদর বারবার পড়বেও না। আর নামাজেও কোনরকম অসুবিধা হবে না। (ছবি নং-৯)

স্ত্রীদের বিশেষ মসলা

১. স্ত্রীদের এহরাম স্বাভাবিক পরিধানের বস্ত্রই হয়। তবে এটা স্মরণ রাখবেন যে পাতলা, টাইট ও এমন না হয় যাতে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কাপড় একেবারে সাধারণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই।

২. বর্তমানে এহরাম স্বরূপ টুপি ও নেকাব পরা হয়। শরীয়তে ওর কোন প্রমাণ নাই।

৩. এহরাম অবস্থায় স্ত্রীদের মুখমন্ডল খোলা থাকা জরুরী।

৪. এহরাম অবস্থায় স্ত্রীদের উপর পর্দার আদেশ থেকে যায়। এইজন্য যদি কোন না মুহরিম সামনে এসে যায় তাহলে কাপড় দিয়ে মুখমন্ডল আড়াল করা যায়। মুখমন্ডলে কাপড় যদি স্পর্শ করে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৫. বর্তমানে স্ত্রীরা টুপি বা কোন শক্ত জিনিস মাথার উপরে রেখে নেয় ও উপর থেকে নেকাব রেখে নেয় যাতে কাপড় মুখমন্ডলে স্পর্শ না করে। এটা পর্দার উত্তম পদ্ধতি কিন্তু ওয়াজেব বা সুন্নত নয়। আর এটা এহরামের অংশও নয়।

৬. যদি সাবধানতার জন্য টুপি পরে থাকেন তাহলে ওজুর সময় খুলে মসেহ করা জরুরী নচেৎ ওজু শুদ্ধ হবে না।

৭. কসর (চুল কাটা) উমরায় সায়ীর পর ও হজ্বে কুরবানীর পর মেয়েদের জন্য নিজের আংগুলের আগার অংশ (আনুমানিক এক থেকে সওয়া ইঞ্চি) মাথার চুল কাটতে হয়। এই চুল স্বয়ং নিজের হাতেও কাটতে পারেন কিম্বা নিজের মতো কোন মহিলা হাজীর মাধ্যমে যিনি কসরের পূর্বের সমস্ত কাজ পূর্ণ করে নিয়েছেন, তাকে দিয়েও কাটাতে পারেন। স্ত্রীদের জন্য নিজের স্বামী বা সঙ্গে আসা মুহরিম পুরুষ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের মাধ্যমে চুল কাটানো শুদ্ধ নয়।

চুল কাটানোর সহজ পদ্ধতি এই যে চুলের ঝুটির শেষ ভাগ আঙ্গুলে জড়িয়ে নেবেন ও পরে কাটবেন। স্মরণ রাখবেন এক বা সওয়া ইঞ্চির কম চুল কাটবেন না।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ

১. স্ত্রীরা উমরায় ও হজ্বে দুটোতেই তালবিয়া আস্তে পড়বেন। যাতে না-মুহরিম পুরুষরা আওয়াজ না শুনতে পায়।

২. এহরাম অবস্থায় চিরুণী করবেন না। যদি জেনে-শুনে কোন চুল পড়ে যায় তাহলে সদকা দিতে হবে।

৩. বিনা খুশবুওয়ালা তেল শরীরে ও চুলে লাগাতে পারেন। চুল ওঠার ভয়ে না লাগানোই উত্তম।

৪. এহরাম অবস্থায় সুরমা লাগানো নিষেধ।

৫. এহমার অবস্থায় মেহেন্দি বা খেজাব লাগানো মকরুহ।

৬. এহরাম অহস্থায় স্ত্রীরা অলংকার পরতে পারেন। কিন্তু অলংকার এমন না হয় যাতে অপরের দৃষ্টি আপনার উপর পড়ে।

৭. স্ত্রীদের জন্য তওয়াফে রমল ও ইজতেবা নেই। আর সায়ীর মাঝে দৌড়াতেও হবে না।

৮. স্ত্রীরা বিনা মুহরিমে হজ্বের সফর করতে পারেন না। যদিও সে ধনী হয়।

৯. মুহরিম ঐ ব্যক্তি যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। যেমন পিতা, ছেলে, ভাই-ভাইপো, ভাগ্নে ও স্বামীর পিতা ইত্যাদি।

১০. বোনাই, ফুফা, খালু ইত্যাদি মুহরিম নয়।

১১. স্ত্রী যদি ধনী হয় সঙ্গে মুহরিমও থাকে স্বামীর বিনা অনুমতিতে প্রথম হজ্ব করতে পারে। কেননা একবার হজ্ব ফরজ। নফল উমরাহ বা হজ্বের জন্য স্বামীর অনুমতি বাঞ্ছনীয়।

১২. এহরাম অবস্থায় হায়েজওয়ালী মহিলা নামাজ ও কুরআন পড়া ব্যতীত সব ইবাদত করতে পারে। তাদের জন্য জিকর, দরুদ ও অন্য ওজিফা শুদ্ধ। উত্তম এই যে প্রতি নামাজের সময় শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন হয়ে ওজু করে যতটা সময় নামাজ পড়তে লাগে এতটা সময় জিকর ও দোয়া ইত্যাদি পড়া। যাতে ইবাদতের অভ্যাস বজায় থাকে।

নারীদের জেহাদ হজ্ব

হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি, হে আল্লাহর রসুল আমরা জেহাদকে উত্তম ইবাদত মনে করি। তাহলে আমরা কি জেহাদ করবোনা? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—তোমাদের জন্য উত্তম জেহাদ মবরুর হজ্ব। (বোখারী শরীফ)

হায়েজ ও নেফাসের মাসায়েল

(১) সফরের পূর্বে হায়েজ আসা

যদি কোন মহিলার মক্কা শরীফের সফরের পূর্বে হায়েজ এসে থাকে এমত অপবিত্র অবস্থায় নাপাক চুল পরিষ্কার করে, নখ কেটে ও স্নান করে এহরামের কাপড় পরে নেবেন ও মীকাত (সীমারেখা) পৌঁছে উমরার নিয়ত করে নেবেন কিন্তু মক্কা শরীফ পৌঁছে তাওয়াফ ও সায়ী করবেন না। পবিত্র হওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ ও সায়ী করবেন। এই অপবিত্র অবস্থায় সে এহরাম অবস্থায় থাকবে ও এহরামের সকল নিষেধ আদেশ জারী থাকবে।

(২) এহরাম পরার পর হায়েজ আসা

যদি কারো এহরাম পরার ও নিয়ত করার পর কিন্তু তাওয়াফ ও সায়ীর পূর্বে হায়েজ এসে থাকে তাহলে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ ও সায়ী করে এহরাম খুলবে। এই অপবিত্র দিনগুলিতে এহরামের নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে।

(৩) তাওয়াফের পর হায়েজ আসা

যদি কারো হায়েজের সময় নিকট হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত না আসে মাতাফে তাওয়াফ করা শুদ্ধ। তবে সাবধানীর জন্য মাতাফের পরিবর্তে প্রথম তলা বা ছাদে তাওয়াফ করবেন। যদি তাওয়াফ করার পর রক্ত এসে যায় তাহলে নাপাক অবস্থায় সায়ীর কাজ পূর্ণ করে চুল কেটে উমরা পূর্ণ করে নেবেন। সায়ীর জন্য পবিত্রতা জরুরী নয়। যদি তাওয়াফ করতে করতে হায়েজ এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে যাবেন ও পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ ও সায়ী করে উমরা পূর্ণ করবেন। যতক্ষণ উমরাহপূর্ণ না হবে এহরামের নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে।

(৪) হজ্বের পূর্বে বা হজ্বের মাঝে হায়েজ আসা

যদি কারো ৮ জিলহজ্বের পূর্বে হায়েজ আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে উমরার মত চুল পরিষ্কার করে নখ কেটে স্নান করে এহরামের নিয়ত করে নেবেন। তাওয়াফে জিয়ারত ছাড়া হজ্বের সমস্ত কাজ পালন করবেন। এইরকম যদি হজ্বের মাঝেও হায়েজ এসে যায় নামাজ পড়া, কুরআন পড়া ও তাওয়াফে জিয়ারত ছাড়া বাকী সকল কাজ পূর্ণ করবেন। তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবেন। যদিও ১২ জিলহজ্ব অতিক্রম করে যায়। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফে জিয়ারত, সায়ী ও চুল কেটে এহরাম খুলবেন। এইভাবে তার হজ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। তাওয়াফে জিয়ারত পর্যন্ত এহরামের নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে।

(৫) উমরাহ ও হজ্ব দুটির পূর্বে হায়েজ আসা

কোন মহিলা তামাত্তোর নিয়তে এহরাম বাঁধে কিন্তু মক্কা শরীফ পৌঁছানোর পূর্বে বা পরে উমরার তাওয়াফের পূর্বে হায়েজ বা নেফাস আরম্ভ হয়ে যায় ও রক্ত জারী থাকা অবস্থায় ৮ই জিলহিজ্জাহ অর্থাৎ মীনা যাওয়ার দিন এসে যায়। এমন মহিলার উমরাহ ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। এহরামের নিষেধাজ্ঞা (খুশবু লাগানো, নোখ কাটা ইত্যাদি) এর মধ্যে কোন কাজ করে চুল খুলে তেল দিয়ে চিরুনি করে উমরার এহরাম খুলে দেওয়া দরকার। পুনরায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোসল করে হজ্বের এহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়ে নেবেন ও মীনা চলে যাবেন ও হজ্বের পূর্ণ কাজ করতে থাকবেন। হায়েজ বা নেফাস বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে পবিত্র হয়ে তাওয়াফে জিয়ারত ও সায়ী করবেন। ঐ মহিলার হজ্ব হজ্বে ইফরাদ গণ্য হবে।

হজ্বের কর্ম পূর্ণ হওয়ার পর ঐ ছেড়ে যাওয়া উমরাহ কাজার নিয়তে একটি উমরাহ করে নেবেন ও কুরবানী অর্থাৎ দম দেবেন। ঐ দম (কুরবানী) পূর্ব উমরাহ ছাড়ার জন্য ওয়াজেব হয়ে যায়।

এমত অবস্থায় হজ্বে তামাত্তোর শুকরিয়া স্বরূপ দম (কুরবানী) ওয়াজেব নয়। এইজন্য যে ওর হজ্বে ইফরাদ হয়েছে। আর হজ্বে ইফরাদকারীর উপর কুরবানী ওয়াজেব নয়। (খায়রুল ফতোয়া ২৩৩/৪ আইনি শরহে বোখারী ১২৩/১০ মিশকাত ৩০৬-৩০৭/৫)

বিঃ দ্রঃ— যে মহিলা নিজের অভ্যাস অনুযায়ী এর উপর আশা থাকেনা যে সে পবিত্র হয়ে হজ্বের পূর্বে উমরাহ আদায় করতে পারবে তার জন্য উত্তম এই যে সে যেন হজ্বে ইফরাদের নিয়ত করে ও এহরাম বাঁধে। যাতে উমরাহ ছাড়ার জন্য দম ওয়াজেব না হয়।

(৬) অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত

২৪-২৭ অক্টোবর ১৯৯৭ খৃঃ মুম্বই হজ্ব হাউসে "১০ম ফেকহি সেমিনার হজ্ব ও উমরার জন্য" যে আয়োজন করা হয়েছিল তাতে যে বিশেষ নির্ণয় ও ফায়সালা নেওয়া হয়েছিল তাতে নির্ণয় নং ১০ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) ধারা নং-১০

যদি তাওয়াফে জিয়ারতের পূর্বে কোন মহিলার হায়েজ বা নেসাফের রক্ত এসে যায় ও তার পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট সময়ে এতটা অবকাশ না থাকে যে সে হায়েজ থেকে পবিত্র হয়ে তাওয়াফে জিয়ারত করতে পারবে তার জন্য প্রথমতঃ জরুরী যে যতদূর সম্ভব চেষ্টার মাধ্যমে (পবিত্র হয়ে তাওয়াফে জিয়ারত করতে পারে এতটা সময়ের জন্য নিজের সফর বিলম্ব করিয়ে নেবেন) যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে হায়েজের অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করবেন ও একটি বড় পশুর কুরবানী (দম) জানাবতের (অপবিত্রতার) নিয়তে করবেন। এইভাবে তার তাওয়াফে জিয়ারত পূর্ণ হয়ে যাবে ও সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

একটি সাবধানতা

এই অবস্থায় সাবধানতা এই যে মহিলারা তাওয়াফে জিয়ারত মাতাফের পরিবর্তে প্রথম তলা বা ছাদে করা। কেননা হুজুর (দঃ) সময়ে ও হজরত উমরের রাজত্বকালে মাতাফ খুব সংকীর্ণ জায়গায় ছিল। আশপাশে কুরেশ পরিবারের ঘরবাড়ি ছিল। হজরত উম্মে হানীর বাড়ি যেখান থেকে হুজুর (সঃ) মেরাজে গিয়েছিলেন আঃ আজীজ গেট দিয়ে প্রবেশ করার পর নীচের তলায় যাওয়ার জন্য বাম দিকে যে রাস্তা আছে ও যেখানে একটি উঁচু জায়গায় কুরআন শরীফ রাখার জন্য আলমারী আছে ওখানেই ছিল। আজ থেকে ৫০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত নতুন হারাম শরীফের মসজিদের জায়গায় হোটেল ও গেস্ট হাউস ছিল যেখানে লোকেরা থাকত। তাতে মহিলারাও থাকতো। তাদের হায়েজ ও নেফাস আসাই স্বাভাবিক।

বর্তমান ঐ স্থানে মাতাফের পাশে সুন্দর মসজিদে হারাম নির্মিত। নামাজ পড়া হয় প্রথম তলায় ও ছাদে তাওয়াফ করা হয়।

হায়েজ ও নেসাফ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা শুদ্ধ নয়। কিন্তু যখন বাধ্য হয়ে প্রবেশ করতেই হচ্ছে, মসজিদে হারামে ক্বাবাগৃহ থেকে নিজেকে এতটা দূরে রাখুন যতটা দূরে হুজুর (দঃ) এর সময়ে হায়েজওয়ালী মহিলারা থাকত। যদি তাওয়াফ প্রথম তলা বা ছাদে করা হয় তা এই দূরত্বটা থাকবে আর তাওয়াফে জিয়ারতও আদায় হয়ে যাবে। হজ্বের কাজও পূর্ণ হয়ে যাবে। (আল্লাহ ভালো জানেন)

(৭) বিনা তাওয়াফে জিয়ারতে ঘরে ফেরা

তাওয়াফে জিয়ারত হজ্বের তিনটি ফরজের মধ্যে একটি ফরজ। যদি কেহ কোন কারণে তাওয়াফে জিয়ারত না করে তার হজ্ব পূর্ণ হবে না। আর নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়তে পারবেন না। দুজনে একে অপরের জন্য ঐ সময় পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষন তাওয়াফে জিয়ারত না করে।

(৮) তাওয়াফে বিদায়ের পূর্বে হায়েজ আসা

যদি কোন মহিলা হজ্বের সমস্ত কাজ পূর্ণ করে থাকেন ও মক্কা শরীফ হইতে রওনা হওয়ার পূর্বে হায়েজ এসে যায় তাহলে এমত অবস্থায় তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। বিদায়ী তাওয়াফ না করে রওনা হয়ে যাবেন। হজরত ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা আছে রসুলুল্লাহ (দঃ) হায়েজওয়ালী মহিলাদের জন্য ছুট দিয়েছেন যে যদি সে তাওয়াফে জিয়ারত করে থাকে তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ না করে সফরে রওনা হয়ে যাবেন। (আহমদ হাদিস নং ৩৫০৫)

লোকসানের সওদা

মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ ও হারাম শরীফের মসজিদের পরিবেশ এতো নুরপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় যে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা এমনিই বাইরের খোলা জায়গায় শুয়ে-বসে থাকে। নামাজের অপেক্ষা করে। আজান হলে ঐখানেই মুসাল্লা বিছিয়ে নামাজ পড়তে আরম্ভ করে দেয়।

যতক্ষন মসজিদে বসে নামাজের আপেক্ষা করা হয়, ঐ সময়টাও নামাজের মধ্যে গন্য হয়। আর তারও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু হাজী সাহেবগন দুটি কারণে এই রকম উৎকৃষ্ট সওয়াব উপার্জন করার সুযোগ নষ্ট করে দেন বরং কখনো কখনো গোনাহগার হয়ে থাকেন।

প্রথম কারণ এই যে বেশির ভাগ হাজী সাহেবগণ ঐ সময় বসে নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার আলোচনায় মগ্ন থাকেন। যার কারণে সওয়াব পান না বরং নামাজের স্থানে দুনিয়ার কথা আলোচনাকারীর উপর ফেরেস্তা লাঞ্ছনা পাঠাতে থাকে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে যখন জামাতের সময় হয় প্রথমে আগের লাইন ভরা উচিৎ। যদি আগের লাইন খালি থাকে আগের লাইন না ভরে পিছনে দ্বিতীয় লাইন বানালে নামাজ শুদ্ধ হয় না। লোক নিজের সামান্য সুবিধার জন্য এদিকে দৃষ্টি দেয় না।

এই বরকতপূর্ণ দুটি মসজিদ যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সওয়াব উপার্জন করা যায় নিজের অন্তরের সামান্য খুশির জন্য আমরা এমন সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে ফেলি। এইজন্য যখনই হারাম শরীফে বসবেন, দুনিয়ার আলোচনা থেকে বাঁচুন ও জামাত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লাইন আগে পূর্ণ করুন।

বাইরের চাতালও খুবই আকর্ষণীয়। আর এখানে বসাও খুব সহজ। এইজন্য জামাত আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে বাইরের চাতাল একদম ভরে যায় কিন্তু প্রথম তলা, ছাদ ও ভিতরে জায়গা খালি থেকে যায়। নামাজ আরম্ভ হওয়ার পর যদি কেহ ভিতরে যেতেও চায় তাহলে যেতে পারে না কিংবা বড় কষ্টে যেতে হয়।

এইভাবে ভিতরে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হওয়ার সাজা বাইরে নামাজ আরম্ভকারীর উপর হবে। এইজন্য যদিও আপনি চাতালে বসে নামাজের অপেক্ষা করেন কিন্তু নামাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ভিতরে চলে যাবেন। প্রথমে ভিতরের স্থান পূর্ণ করুন। হারাম শরীফের ভিতরের অংশ পূর্ণ হওয়ার পরই বাইরে নামাজ পড়ুন। আল্লাহ পাক আপনার ইবাদত কবুল করুন ও হজ্জে মবরুরের তৌফিক দিন। আমীন।

এহ্‌রাম অবস্থায় নিষেধ কর্ম ও তার সাজা

কর্ম—১

১। শরীরের কোন অংশ থেকে চুল তোলা, কাটা বা মুন্ডন করা

২। নখ কাটা

৩। খুশবু লাগানো

৪। পুরুষদের জন্য মাথা ঢাকা

৫। পুরুষের শারীরিক গঠন অনুযায়ী সেলাই করা বস্ত্র পরা

৬। মহিলাদের হাতে মোজা ও নেকাব পরা

কাফফারা (সাজা)

● এহরাম অবস্থায় যদি কোন কারণে ১ ঘন্টার কম সময় পর্যন্ত মাথা ঢাকা থাকে একমুষ্টি গম বা তার মূল্য দান করা ওয়াজেব। যদি ১২ ঘন্টার কম সময় মাথা ঢাকা থাকে পৌণে দু' কেজি গম বা মূল্য দান করতে হবে। যদি ১২ ঘন্টার বেশি সময় মাথা ঢাকা থাকে তাহলে একটা ছোট পশু (ছাগলের) কুরবানী ওয়াজেব।

● এহরাম অবস্থায় খুশবু (সুগন্ধ) লাগানো নিষেধ। ফুলেও সুগন্ধ থাকে। এহরাম অবস্থায় ফুলের মালা পরা শুদ্ধ নয়।

● এহরাম অবস্থায় যে যে কাজ করা নিষেধ সেগুলি করলে একমুষ্টি গম থেকে ১টি পশুর কুরবানী পর্যন্ত কিছু না কিছু জরিমানা অবশ্যই ওয়াজেব হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ মসলার বইয়ে দেখে বা কোন আলেমের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নেবেন।

কর্ম—২ ঃ অরণ্যের বা মাঠের পশুর শিকার করা বা শিকারের জন্যে কারও সাহায্য করার কাফফারা—ঐরূপ একটি পশু সদকা করা।

কর্ম—৩ ঃ স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা। কাফফারা—যদি বীর্যপাত না হয় তৌবা বা ইসতেগফার করা (ক্ষমা চাওয়া)। যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তার কাফফারা একটি গরু বা উট দম কুরবানী দিতে হবে।

কর্ম—৪ ঃ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা। কাফফারা—যদি সহবাস ১০ তারিখে বড় শয়তানকে পাথর মারার পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে হজ্ব শুদ্ধ হবে না। তাকে হজ্বের অন্য বাকী কাজ পূর্ণ করতে হবে। আগামী বৎসর দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে হবে। একটি গাই বা উট দম দিতে হবে। যদি সহবাস ১০ তারিখে বড় শয়তানকে পাথর মারার পর হয় তাহলে হজ্ব শুদ্ধ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে।

কর্ম—৫ ঃ হজ্ব ও উমরার ওয়াজেব কাজ ছেড়ে যাওয়া। কাফফারা—যদি হজ্ব ও উমরার কোন ওয়াজেব কাজ ছেড়ে যায় তাহলে হজ্ব ও উমরাহ হয়ে যাবে, তবে দম দিতে হবে।

কর্ম—৬ ঃ হজ্ব ও উমরার ফরজ কাজ ছেড়ে যাওয়া। কাফফারা—হজ্ব ও উমরার যেকোন ফরজ কাজ যদি ছেড়ে যায় তাহলে হজ্ব বা উমরাহ হবে না। এমত অবস্থায় হাজী তাওয়াফ, সায়ী ও মাথা মুন্ডন করে এহরাম খুলে দেবেন ও আগামী বৎসর পুনরায় হজ্ব ও উমরাহ আদায় করতে হবে।

(এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য কোন আলেমের সঙ্গে যোগাযোগ করুন)

কর্ম—৭ ঃ কোন ব্যক্তি হারামের অসম্মান করে। যেমন-হারামের সীমায় ঘাস ছেঁড়া, গাছের পাতা ছেঁড়া কিংবা এমন কোন কাজ করা যা নিষেধ আছে। কাফফারা—তৌবা বা এসতেগফার করা ও দমও দিতে হবে।

কর্ম—৮ ঃ অপবিত্র অবস্থায় হারাম শরীফে প্রবেশ করা। কাফফারা—একটি উট বা গাই কুরবানী করতে হবে।

(বি. দ্র.—উপরে উল্লেখিত কাফফারা আমি খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। ভিন্ন মসলক অনুপাতে ভিন্ন হুকুম আছে। এইজন্য এ ব্যাপারে আপনি নিজ মসলকের আলেমের পরামর্শ নিন।)

গৃহীত হজ্ব

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসুল কোন আমলটা সবর্ব উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রসুলের উপর ইমান রাখা। জিজ্ঞাসা করে, তারপর? তিনি বলেন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা জিজ্ঞাসা করেন তারপর? তিনি বলেন, মবরুর হজ্ব।

সারা জীবনের কাফফারা

হজরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এর কাছে শুনেছি—যে ব্যক্তি হজ্ব করে ও কোন লজ্জার কাজ না করে ও গোনাহ থেকে বিরত থাকে, গোনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়ে যাবে যেন আজই জন্ম নিয়েছে। (বোখারী, মুসলিম)

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—এক উমরাহ হইতে দ্বিতীয় উমরার মাঝের সমস্ত গোনাহ কাফফারা হয়ে যায় ও মবরুর হজ্বের প্রতিদান জান্নাত। (বোখারী, মুসলিম)

হারাম শরীফের কয়েকটি বিশেষ স্থান

মদিনা শরীফের ঐতিহাসিক স্থান

মসজিদে কুবা ঃ যখন নবী (দঃ) হিজরত করে মদিনা শরীফ পৌঁছান সর্বপ্রথম তিনি ঐ মসজিদের ভিত রাখেন ও স্বয়ং ঐ মসজিদের নির্মাণ করেন। বাস্তবে এটি প্রথম মসজিদ ছিলো যাতে তিনি নিজ সাহাবাদের নিয়ে প্রকাশ্যে জামাত সহ নামাজ পড়ান। মসজিদে কুবায় নামাজ পড়ার ফজিলত স্বরূপ হজরত সহল বিন হানীফ হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে মসজিদে কুবায় পৌঁছায় ও এখানে দুই রাকাত নামাজ পড়ে একটি উমরার সাওয়াব পাওয়া যায়।

মসজিদে ইজাবাহ ঃ এই মসজিদে নবীজী (দঃ) তিনটি দোয়া করেন। এর মধ্যে দুটি দোয়া আল্লাহপাক কবুল করেন। তবে একটি দোয়া যে "আমার উম্মতের মধ্যে মতভেদ না হোক" এই দোয়াটি কবুল করেন নি।

মসজিদে জুম্মা ঃ ইহাকে মসজিদে জুম্মা এই জন্য বলা হয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন কুবা গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করার পর মদিনা শরীফের দিকে গমন করেন ঐ স্থানে তিনি সর্বপ্রথম জুম্মার নামাজ পড়িয়েছিলেন। সাহাবারা ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

মসজিদে ক্বেবলাতায়েন ঃ হুজুর (দঃ) বানি সালমার এলাকায় সাহাবাদের সঙ্গে জোহরের নামাজ পড়ছিলেন। দুই রাকাত নামাজ পূর্ণও হয়েছিল। এমন অবস্থায় ক্বেবলা পরিবর্তনের আদেশ এসে যায়, তিনি নামাজেই ক্বাবা শরীফের দিকে ঘুরে যান, ঐ মসজিদে একই নামাজ দুই কেবলার দিকে মুখ করে পড়া হয়েছিল। এই জন্য একে মসজিদে ক্বেবলাতায়েন বলা হয়।

মসজিদে বানি হারেসা (মসজিদে সুতরাহ) হুজুর (দঃ) ওহদের যুদ্ধ হইতে ফেরার সময় বিশ্রামের জন্য ঐ স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিলেন। এই জন্য ইহাকে মসজিদে সুতরাহ বলা হয়। এই মসজিদ হুজুর (দঃ) যুগেই নির্মাণ করা হয়েছিল।

মসজিদে ফাতাহ ঃ এই মসজিদ মদিনা শরীফের উত্তরে একটি পাহাড়ে "খালা'য়" অবস্থিত। ইহাকে মসজিদে ফাতাহ এইজন্য বলা হয়, আল্লাহতায়ালা খন্দকের যুদ্ধের সময় ঐ স্থানে হুজুর (দঃ) কে সাহায্য ও জয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হুজুর (দঃ) সাহাবাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য ও জয়ের সুসংবাদে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

মসজিদে গামামা ঃ এই মসজিদ, মসজিদে নবভীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাবে সালাম হইতে আধ কিলোমিটার দুরত্বে। এটি ঐ ময়দানে অবস্থিত যাকে হুজুর (দঃ) ঈদের নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। একটি উদ্ধৃতি অনুযায়ী হুজুর (দঃ) নাজ্জাশী বাদশার অনুপস্থিতির নামাজে জানাজা ঐ স্থানেই পড়িয়েছিলেন। ইহাকে মসজিদে গামামা এই জন্য বলা হয় যে নামাজের সময় একখণ্ড বাদল হুজুর (দঃ)-কে ছায়া করেছিল।

জাবালে ওহদ ঃ ওহদ পাহাড় একটি বৃহৎ পাহাড়। যাহা মদিনা শরীফের উত্তরদিকে ও মসজিদে নবভী হইতে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ইহা হারামের সীমার মধ্যে। ইহার দৈর্ঘ্য ছয় কিলোমিটার ও লাল রং মিশ্রিত।

হুজুর (দঃ) এর ফজিলত স্বরূপ বলেছেন এটি এমন একটি পাহাড় যে আমায় ভালোবাসে ও আমিও ওকে ভালোবাসি।

এই পাহাড়ের সন্নিকটে ওহদের যুদ্ধ হয়েছিল। যাতে হুজুর (দঃ) এর চাচা হজরত হামজা ও অন্য সাহাবারা (রঃ) শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর রুবায়ী দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল ও উজ্বল মুখমণ্ডলেও আঘাত লেগেছিল। পবিত্র ঠোঁটেও আঘাত লেগেছিল। ঐ পাহাড়ের কোলে ওহদ যুদ্ধের শহীদদের সমাধি আছে।

জান্নাতুল বাকী ঃ এটি মসজিদে নবভীর সংলগ্ন একটি কবরস্থান যাতে আনুমানিক ১০ হাজার সাহাবার সমাধি আছে। হুজুর (দঃ) এর পবিত্র সন্তান ও মুসলিম জননী পবিত্র স্ত্রীগণকেও এখানেই সমাধিস্থ করা হয়।

মসজিদে নবভী (দঃ) ঃ মসজিদে নবভীর দ্বীনি ফজিলত তো আছেই। বাস্তবেও তার এক বিশেষ স্থান আছে। তার বিশেষত্ব জেনে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। এটা পৃথিবীর সুন্দরতম প্রাসাদ, এত সুন্দর ও মূল্যবান প্রাসাদ মনুষ্য ইতিহাসে কখনো নির্মাণ হয়নি। একে নির্মাণ করতে আনুমানিক ৩৬০ আরব টাকা খরচ হয়েছে। টেলিভিশনের ডিসকোভারী চ্যানেলে একে পৃথিবীর আটটি সুন্দর প্রাসাদের মধ্যে একটি গণ্য করেছে। গ্যালিশ বুক অফ ওয়ার্লড রেকর্ডে একে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ গণ্য করা হয়েছে। এর সৌন্দর্য্য দেখার সাথে সাথে কিছু বোঝার ও সম্পর্ক আছে। হজ্বের এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আপনি উহা "তামিরে মসজিদে নবভী" C.D. মাধ্যমে দেখতে পারেন কিংবা "তারিখে মদিনা মুনাওওরা" পুস্তক পড়ে নিন। এই দুটি আপনি মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের যে কোন পুস্তকের দোকানে পেয়ে যাবেন।

ঐ মসজিদ সম্পর্কে কেবল দুটি কথা উল্লেখ করছি যাতে আপনি ওর নির্মাণ সম্পর্কে কিছুটা অনুভব করতে পারেন।

১। যদি আপনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মসজিদে নবভীর দরজা

দেখেন, আপনাকে খুব সুন্দর লাগবে। কাঠের এই দরজাগুলি কেবল সোনা ও সোনাযুক্ত প্লেটের ষ্টীল দিয়ে জোড়া হয়েছে। ঐ দরজাগুলি তৈরীর জন্য আফ্রিকার জঙ্গল থেকে বিশেষ কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছে ও তাতে ছেদ করার জন্য জার্মানে পাঠানো হয়েছে, পুনরায় কেনাড়ার উত্তম শিল্পীর মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়েছে। এক একটি দরজার ওজন কয়েক টন। এতো ওজন হওয়া সত্ত্বেও একজনের দ্বারা খোলা বা বন্ধ করা যায়।

২। ঐ মসজিদের টাইলস খুবই সুন্দর। আপনি হয়তো চিন্তা করছেন এই সুন্দর টাইলস পৃথিবীর উৎকৃষ্ট টাইলস তৈরীর কারখানা হইতে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু না, বরং এই মসজিদের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট টাইলস নির্মাণের জন্য কারখানা তৈরী করা হয়। ওই টাইলস তৈরী করে ব্যবহার করা হয় পুনরায় মসজিদে লাগানো হয়। এইভাবে এই মসজিদের প্রতিটি জিনিস অতুলনীয়। আপনি ইহাকে বুঝে নিজের দৃষ্টিতে জমিয়ে নিন। এই চিন্তাধারা নিয়ে যখন আপনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন আপনি নিজেকে জান্নাতে অনুভব করলেন।

মদিনা শরীফের কয়েকটি বাজার, পাড়া ও বাগানের উল্লেখ হাদীস শরীফে এসেছে। ঐ সকল স্থানের কিছু চিহ্ন এখনো বর্তমান আছে যার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

১। খাকে শিফা—এই মাটি দিয়ে হুজুর (দঃ) চিকিৎসার পদ্ধতি বলেছিলেন।

২। বানী নজরগণের গৃহ—এটি হুজুর (দঃ)-এর মাতা আমীনার গোত্র।

৩। বাগে শমুন—এটি ঐ ইহুদীর বাগান যাতে হজরত আলী (রঃ) কাজ করতেন।

৪। বাগে সালমান ফারসি—এই বাগানে হুজুর (দঃ) হজরত সালমান ফারসি (রঃ)-কে স্বাধীন করার জন্য নিজের হাতে বৃক্ষ রোপন করেছিলেন।

৫। বীরে খাতম—এই কূপে হুজুর (সঃ) আংটি হজরত উসমান (রঃ)-র আঙ্গুল হইতে পড়ে যায়। অনেক সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি।

৬। বীরে উসমান—এই কূপটি হজরত উসমান (রঃ) ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওকফ্ করেছিলেন।

৭। বানী সালমা গোত্রের কবরস্থান—এই কবরস্থানে হজরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহতায়ালার আদেশে মৃতকে জীবিত করে হুজুর (দঃ)-এর সহিত কথা বলেছিলেন।

মসজিদে সবক, সালমা গোত্র, মসজিদে বোখারী, বানী জাফর গোত্র, আয়র গোত্র, রায়া পাহাড় ইত্যাদি এই সকল ঐতিহাসিক স্থানের জন্য গাইডের সাহায্য নিন।

মক্কা শরীফের ঐতিহাসিক স্থান

মাওলাদে রসূল (দঃ)—(রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর জন্মস্থান) এটি ঐ স্থান যেখানে রসূলুল্লাহ (দঃ) ২২ এপ্রিল ৫৭১ খৃস্টাব্দে বিশ্বের রহমত হয়ে এই জগতে আগমন করেছেন। বর্তমানে ঐ স্থানে একটি লাইব্রেরী ও মাদ্রাসা আছে। এই স্থানটি হারাম শরীফ হইতে ৩৭৫ মিটার দূরত্বে সাফা ও মারওয়াহের দিকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে।

জান্নাতুল মুয়াল্লা—এটি মক্কা শরীফের কবরস্থান। এখানে মসলিম জননী হজরত খাদিজা (রঃ), বহু সাহাবা (রঃ), ও আল্লার ওলিরা সমাধিস্থ আছেন। ইহা মসজিদে জ্বিনের নিকট, মিনা যাওয়ার রাস্তায় পড়ে।

মসজিদে জ্বিন—এই স্থানে রসূলুল্লাহ (দঃ) জ্বিনদেরকে বাইয়াত করেছিলেন।

মসজিদে রায়াহ—ইহা ঐ স্থান যেখানে রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের সময় নিজের পতাকা স্থাপন করেছিলেন।

জাবালে নূর—এই পাহাড়টি মক্কা শরীফ হইতে মিনা যাওয়ার পথে তিন মাইল দূরত্বে পড়ে। এর উচ্চতা আনুমানিক ২০০০ ফুট। এর উপরে গারে হীরা আছে। যেখানে প্রথমবার হুজুর (দঃ)-এর উপরে ওহি অবতীর্ণ হয়।
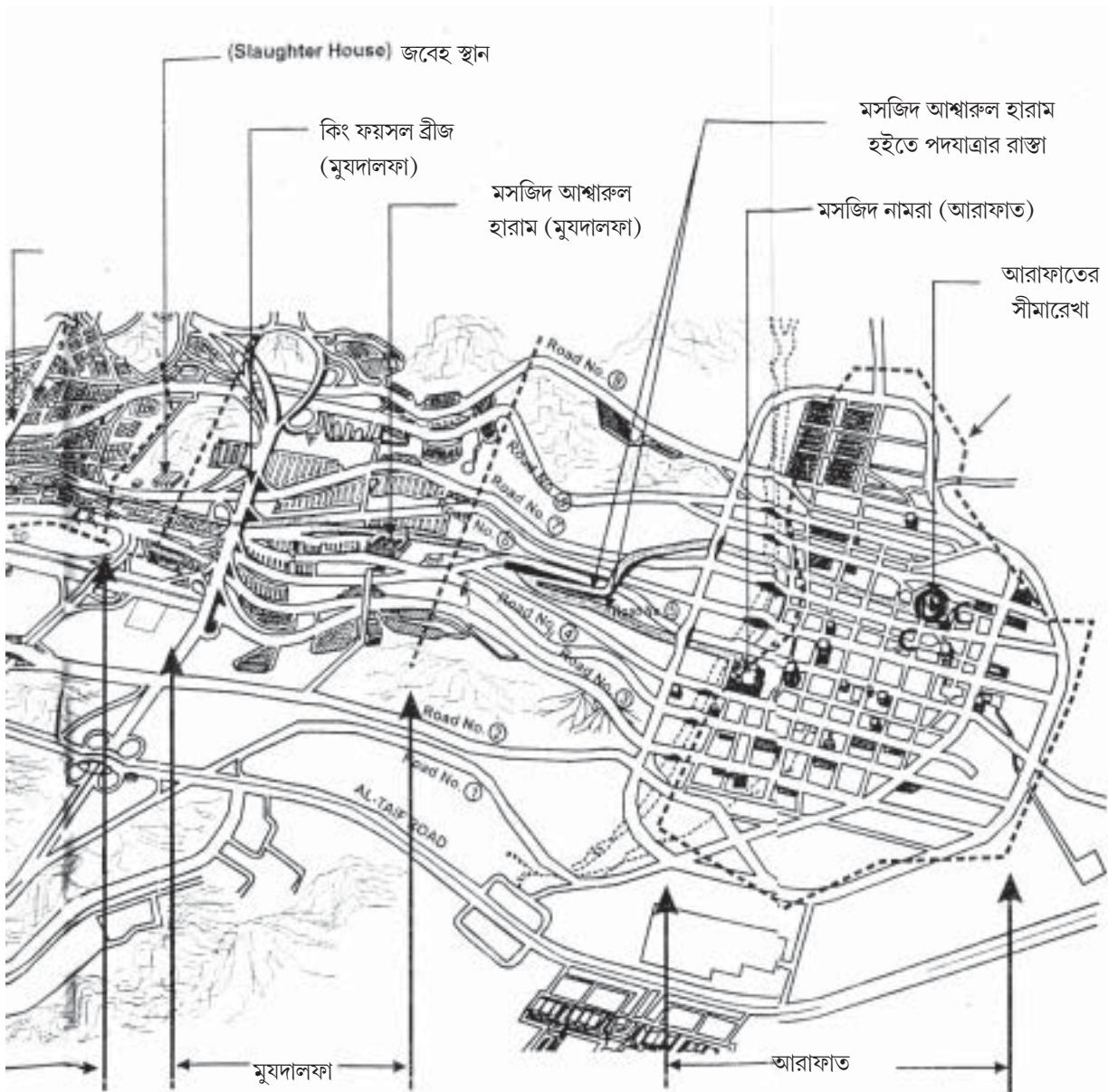
জাবালে সুর—এই পাহাড়টি মক্কা শরীফ হইতে ছয় মাইল দূরত্বে। এর উপরে গারে সুর আছে। যেখানে হুজুর (দঃ) হিজরতের সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিকের (রঃ) সঙ্গে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। উল্লেখিত দুটি পাহাড়ে দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসুস্থ লোকদের না চড়া উচিত।

মসজিদে আয়েশা—এই মসজিদটিকে মসজিদে তানয়ীম বলা হয়। ইহা হারামের সীমার বাইরে। মক্কা শরীফে থাকা অবস্থায় যদি কেহ উমরা করতে চান তাহলে এই স্থানে এসে উমরার এহরাম বাঁধতে হয়।
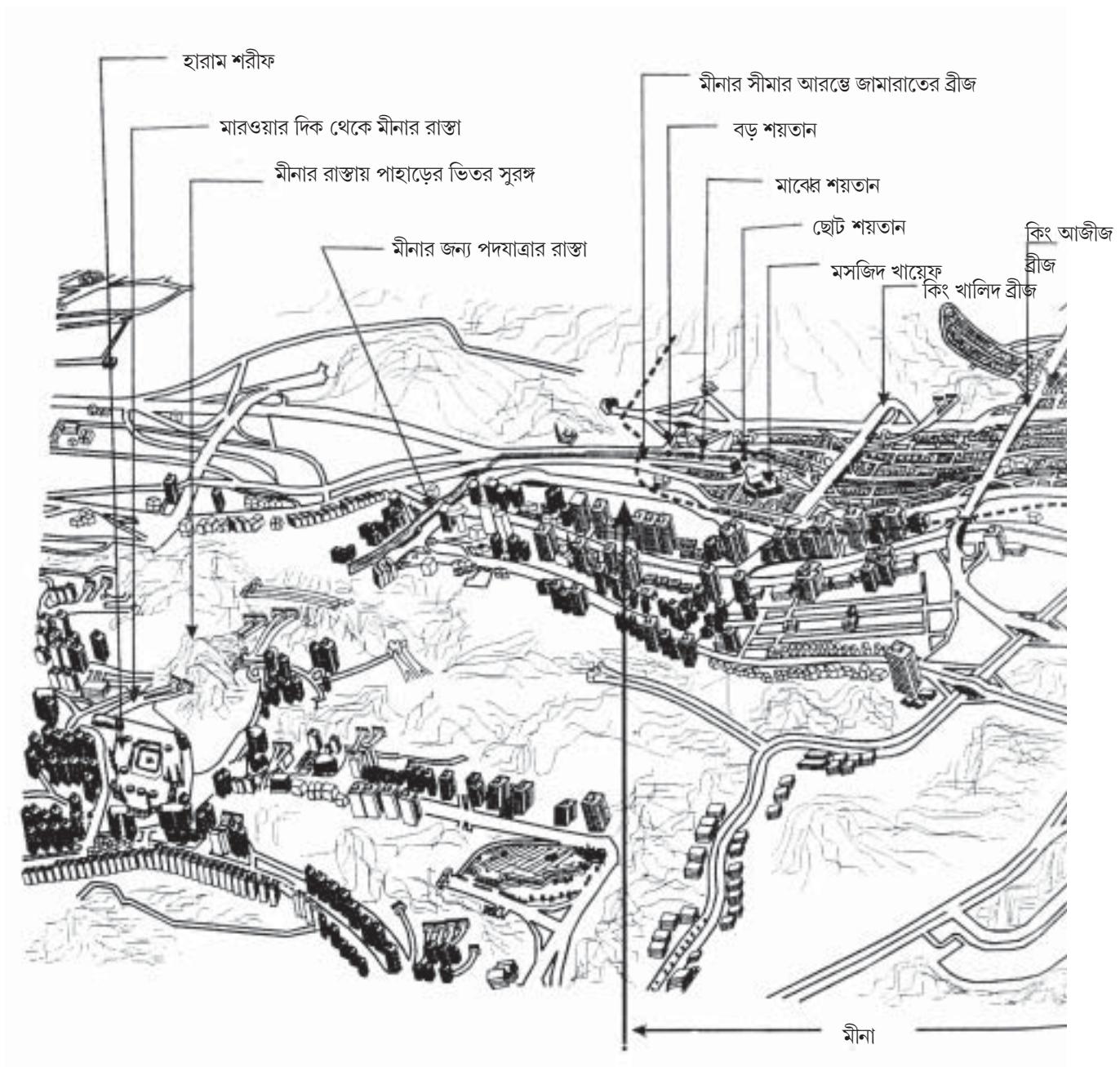
হজরত খাদিজা (রঃ)-র গৃহ—এই স্থানে হুজুর (দঃ) মদিনা শরীফে হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। হজরত ইব্রাহিম ব্যতীত তাঁর সকল সন্তান এখানেই জন্ম নেন। এই স্থানটি মারওয়াহের দিকে ছাপরা বাজারে প্রবেশ করতেই স্বর্ণকারের প্রথম সারিতে অবস্থিত। বর্তমান এখানে হিফজখানা স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ছাত্ররা কুরআন শরীফ হিফজ করে।

মসজিদে খায়েফ, মসজিদে নামরাহ, মসজিদে শারুল হারাম, জাবালে রহমত, জামারাত এইগুলি ঐ স্থান যেখানে হজ্বের বিশেষ পাঁচ দিনে আপনাকে যেতে হবে। কিন্তু লোকের ভীড়ের জন্য কোন স্থান ঠিকমত দেখতে পাবেন না। এইজন্য হজ্বের পূর্বে বা পরে শান্তির সঙ্গে ঐ স্থানগুলি অবশ্যই দেখবেন।

আরাফাতের নিকটের চিত্র

হারাম শরীফ, মীনা, মুযদালফা ও আরাফাতের নিকটের চিত্র

হজ্বের রহস্য, মীকাত ও হারামের সম্মানের বর্ণনা

হজ্ব প্রকৃত পক্ষে পরলোক গমনের প্রস্তুতি। যখন কেহ মারা যায়, বন্ধু-বান্ধব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্নান করিয়ে ও কাফন পরিয়ে কবরস্থানে ছেড়ে আসে। মৃতব্যক্তি মানবশুন্য স্থানে কিয়ামত পর্যন্ত পড়ে থাকে। তারপর কিয়ামতের দিন নিজের কবর থেকে বেরিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে ও আল্লাহর নিকট নিজের কৃতকর্মের হিসাব দেবে। যদি কোন কারণে নেকীর ওজন কম হয় তাহলে তাকে আর কোন সুযোগ দেওয়া হবে না বরং সাজা দেওয়া হবে।

এটা আল্লাহরই করুণা যে তিনি মানুষের উপর হজ্ব ফরজ করে পরলোক গমনের প্রস্তুতির অবকাশ দিয়েছেন। আর এরও অবকাশ দিয়েছেন যে, ইহকালের হাশরের ময়দানে অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে ক্রন্দন করে অশ্রু ফেলে নিজের গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করে নেয়।

হাজী কাফন (এহরাম) পরে মানবশুন্য স্থানে (মীনায়) যান ও পুনরায় ওখান থেকে হাশরের ময়দান (আরাফাত) যান ও সারাদিন আল্লাহর ইবাদত করেন এবং কেঁদে কেটে পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিয়ে পরিত্রাণ করিয়ে নেন।

আল্লাহ পাকের এই করুণা ও মেহেরবানীর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। হজ্বের বিশেষত্ব বোঝা প্রয়োজন। মৃত্যু আসার পূর্বে বা সূর্য্য মাথার উপর এসে যাওয়ার আগে অর্থাৎ কেয়ামত আসার আগেই, শুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্ব করে নিজের পরকাল সুসজ্জিত করে নেওয়া দরকার।

সীমারেখা (মীকাত)

মীকাত, হারাম শরীফের চতুর্দিকে ঐ সীমারেখা যেখান থেকে উমরা বা হজ্বের নিয়তে এহরামপরা বাঞ্ছনীয়। যদি কেহ এহরাম না পরে হারাম শরীফের দিকে মীকাতের সীমায় প্রবেশ করে যায় তাহলে তাকে দম দিতে হবে। ভারত থেকে যাওয়ার পথে মীকাত ইয়ালামলাম পাহাড়ী এলাকা। মদীনা শরীফ হইতে মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে মীকাত জুল হুলাইফা।

হারামের সম্মান

মসজিদ ঐ বস্তু দিয়ে গঠন করা হয় যা দিয়ে কারো বাড়ী তৈরী হয়। কিন্তু মসজিদে ঐ সমস্ত কাজ করতে পারেন না যেগুলি বাড়ীতে করতে পারেন। মসজিদ আল্লাহর ঘর, এইজন্য সম্মানীত।

যদি মসজিদে ঐ সমস্ত কাজ করেন যা আপনি ঘরে করেন, তবে বড় গোনাহগার হবেন। মক্কা শরীফ মদীনা শরীফ ঐ রকমই শহর যেমন আপনার শহর। কিন্তু যেহেতু মক্কা শরীফে আল্লাহর ঘর ও মদীনা শরীফে রসূলুল্লাহকে (দঃ) সমাধিস্থ করা হয়েছে এইজন্য এই দুটি শহর বিশেষ সম্মানীত। আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল এই দুই শহরকে হারাম ঘোষিত করেন ও অনেক কাজ নিষেধ করেন। যদি আপনি এই দুটি শহরে নিজের শহরের মতো ঐ সমস্ত কাজ করেন বড় গোনাহগার হবেন।

হারামের সীমায় নিম্নলিখিত কাজগুলি নিষিদ্ধ

(১) ঝগড়া ও মারামারি করা

(২) ঘাস বা গাছকাটা, কোন গাছের ডাল কাটা বা ভাঙ্গা (আপনি হারামের সীমায় একটি ঘাসের পাতাও ছিঁড়তে পারবেন না।)

(৩) শিকার করা, কোন শিকার করা পশুকে ভয় দেখানো বা তাড়া দেওয়া , হারামের সীমায় জংলী পশুরও শান্তি। তাদেরকে মারা ও কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, যদি তারা ছায়ায় থাকে তাদেরকে সরিয়ে ছায়ায় বসাও নিষিদ্ধ।

(৪) পথে পড়ে থাকা বস্তু তুলে নেওয়া—

উল্লেখিত কাজের মধ্যে কোন একটি কাজ কোন ব্যক্তি করে তবে সে গোনাহগার হবে ও কাফফারা দিতে হবে।

মীনা ও মুযদালফা হারামের সীমায় গণ্য

আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে বলেছেন, যে ব্যক্তি এই মাসগুলোয় হজ্বের নিয়ত করে নেয় তার জন্য হজ্বে (ঐ দিনে) স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করবে না, না কোন অসৎ কর্ম আর না কারো সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত। আর যে সৎকর্ম তোমরা করবে আল্লাহ অবগত হবেন। (সুরা বাকারাহ-১৯৭)

মক্কা শরীফ ও ক্বাবা শরীফের ইতিহাস

★ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় পানির স্তর থেকে সর্বপ্রথম ক্বাবার স্থান প্রকাশ পায়। তারপর ভূমি তার নীচে থেকে বিস্তার করা হয়। (মারেফাতে ক্বাবা-পৃ-৫)

★ আল্লাহতায়ালা বলেন, মানুষের জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে তৈরী করা প্রথম ঘর মক্কায় অবস্থিত। যেটি পুরো বিশ্বের জন্য হিদায়ত ও বরকতপূর্ণ। (সুরা আল ইমরান-৯৬)

★ ক্বাবাগৃহের নির্মাণ ১২ বার করা হয়। যার মধ্যে ৫ বার খুব বিখ্যাত।

(১) ফেরেশতারা ১ম বার নির্মাণ করেন।

(২) হজরত আদম (আঃ) ২য় বার নির্মাণ করেন।

(৩) হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ৩য় বার নির্মাণ করেন।

(৪) হুজুর (দঃ) যখন ২৫ বৎসরের ছিলেন, কুরেশরা মেরামত করেন।

(৫) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবের ৬৫ হিঃ নতুনভাবে নির্মাণ করেন।

★ হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) সময়ে হাতীম ক্বাবার মধ্যে গন্য ছিল। কুরেশরা যখন ক্বাবা গৃহের মেরামত করেন হালাল ও পবিত্র সম্পদে কম হওয়ার কারনে ক্বাবাগৃহ পূর্ব অবস্থায় নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি ও হাতীমের অংশ ক্বাবাগৃগের মধ্যে গন্য করতে পারেননি।

★ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবের যখন ক্বাবাগৃহ নির্মাণ করেন, হাতীমও ক্বাবা গৃহের মধ্যে গন্য করেন ও পূর্বের মত ক্বাবাগৃহে দুটি দরজা বসিয়েছিলেন। একটি পূর্ব দিকে ও অপরটি পশ্চিমদিকে।

যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কার গভর্নর হন হজরত জুবেরকে শহীদ করেন ও খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের অনুমতিতে হাতীমকে পুনর্বার ক্বাবাগৃহ হইতে পৃথক করে দেয় ও পশ্চিম দিকের দরজাও বন্ধ করে দেন। খলিফার কাছে যখন হজরত আয়েশার (রাঃ) হাদীস পৌঁছায় আফসোস করেন—কিন্তু তিনি ক্বাবাগৃহ ঐ অবস্থাতেই রাখেন। আজ পর্যন্ত ক্বাবাগৃহ ঐ অবস্থায় আছে।

★ কুরআন শরীফে মক্কা শরীফকে ৫টি নামে স্মরণ করা হয়েছে।

(১) মক্কা (২) বাক্কা (৩) আল বালাদ (৪) আল আমীন ও (৫) উম্মুল কুরা।

★ অন্য ধর্মীয় গ্রন্থেও ক্বাবাগৃহের উল্লেখ আছে। হিন্দু গ্রন্থে ক্বাবা গৃহকে নিম্ন নামে স্মরণ করা হয়েছে। যথা— ইল আসপদ, নাভাপর যিউয়া, আদি পুশকর তীর্থ, মুক্তিশ্বর, ইলাইয়াসপদ, নাভীকমল, দারদুকাবন।

★ বাইবেলে মক্কা শরীফকে আওরত নামে স্মরণ করা হয়েছে। কেননা মক্কা শরীফ পৃথিবীর প্রথম শহর ও সকল শহরের মা।

★ আল্লাহতায়ালা ক্বাবা গৃহের চতুর্পার্শ্বের একটি বড় এলাকাকে হারাম ঘোষনা করেন। হজরত জিব্রীল (আঃ) ঐ এলাকার চিহ্ন হজরত ইব্রাহীমকে (আঃ) অবগত করান। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) হারামের সীমারেখায় গম্বুজ তৈরী করেছিলেন। প্রতি যুগে তার মেরামত হতে থাকে। আজও জারী আছে। যার মধ্যে ১টি তানয়ীম। সেখান থেকে উমরার জন্য এহরাম বাঁধতে হয়। ঐ এলাকার প্রতি জন্তুর শান্তি। আল্লাহ পাক বলেন যে, ব্যক্তি এই হারামে প্রবেশ করে যাবে সে শান্তিওয়ালা হয়ে যায়। (আল ইমরান-৯৮) এই এলাকায় যদি কেহ খুন করেও প্রবেশ করে তবু তাকে হারামে কতল করা হবে না, গ্রেফতারও করা হবে না। যতক্ষন পর্যন্ত হারামের বাইরে না আসবে। তবে যদি সে হারামেই অপরাধ করে তাহলে সাজা দেওয়া হবে কেননা সে হারামকে অসম্মান করেছে।

★ হুজুর (দঃ) বলেছেন, মসজিদে হারামে একটি নামাজ একলক্ষ নামাজের চেয়ে উত্তম (মুসনাদে আহমদ)। অর্থাৎ এক ওয়াক্তের নামাজ ৫৫ বৎসর নামাজেরও বেশী ও এই একলক্ষ গুন সওয়াব প্রতি নেক কাজের জন্য। এই রকম মক্কা শরীফে যেমন সওয়াব বেড়ে যায় তেমন গোনাহও বেড়ে যায়।

★ মাক্বামে ইব্রাহীম ঐ পাথরকে বলা হয়, যেটাকে আল্লাহতায়ালা হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) জন্য নরম করে দিয়ে ছিলেন ও তার উপর দাঁড়িয়ে তিনি ক্বাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তার উপর হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) পদচিহ্ন আছে। পূর্বে এই পাথরটি ক্বাবাগৃহের সংলগ্ন ছিল। আল্লাহপাক বলেন , তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের জায়গা করে নাও। (বোখারী-৭০২)

মুসলমানের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারনে নামাজ পড়ার জন্য তাওয়াফকারীদের অসুবিধা হতে থাকে। হজরত উমর (রাঃ) তাকে ক্বাবাগৃহ হইতে আনুমানিক ১৪ মিটার দুরে রাখেন ও বর্ত্তমানে ঐখানেই আছে। (কতহুল বারি শরহে হাদিস-৭৭৮৩)

★ ক্বাবাগৃহের উপর প্রথম বার গেলাফ (কভার) মুর্খতার যুগে তুবআ আসআল হামিরি চামড়ার পরিয়েছিল। হুজুর (দঃ) মক্কা বিজয়ের পর ইয়ামনী কাপড়ের গেলাফ পরান। নাসির আব্বাসী প্রথমবার কালো রং এর গেলাফ পরান। তখন থেকে আজও কালো রং-এর গেলাফ পরানো হয়।

★ হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম দুটি জান্নাতের চমকদার পাথর ছিল। কিন্তু আল্লাহপাক তার জ্যোতি নষ্ট করে দেন। যদি আল্লাহ পাক দুটির নুর নষ্ট না করতেন পৃথিবী থেকে আকাশের মাঝে কিম্বা পূর্ব হইতে পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে পুরো বিশ্বকে আলোকিত করে দিতো। (মুসনদে আহমদ-২১৭/২)

★ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট পানি আবে জমজম। ইহা খাদ্য হিসাবেও গন্য ও রোগ মুক্তিরও কারন। (মুজামে কাবীর, তিবরানী হাদিস- ১১১৬৮)

★ হাজরে আয়ওয়াদ ও ক্বাবার দরজার মাঝের স্থানকে মুলতাযিম বলা হয়। হজরত মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঐ স্থানে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবে আল্লাহ পাক অবশ্য কবুল করবেন। (তারিখে মক্কা-আযরকী-৩৬৮/২) হুজুর (দঃ) এই স্থানে দেওয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে এমনভাবে দোয়া করতেন যেমন বাচ্চা তার মাকে জড়িয়ে থাকে। এখানে এইভাবে দোয়া চাওয়া সুন্নত।

তাওয়াফের বর্ণনা

★ আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে বলেছেন, ঐ পুরাতন ঘরের তাওয়াফ করা উচিৎ (সুরা হজ্জ-২৯)

★ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করে ও দুই রাকাত নামাজ পড়ে তাকে ১টি গোলাম স্বাধীন করার সওয়াব দেওয়া হয়। (ইবনে মাজা আল মানাসিক উত্তম তাওয়াফের অধ্যায়-২৯-৫৬)

★ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লার ৭ বার তাওয়াফ করে আললাহ পাক প্রতি পদক্ষেপে তার গোনাহ ক্ষমা করে থাকেন ও প্রতি পদক্ষেপে নেকি লিখে থাকেন ও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে দরজা উচ্চকরে থাকেন। (ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাববান)

★ হজরত ইমাম গাজ্জালী এহইয়াউল উলুম কিতাবে হজরত ইবনে উমরের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন। হুজুর (দঃ) বলেছেন, ক্বাবাগৃহের তাওয়াফ খুব করতে থাকো। ওটা বড় মহান কর্ম যা তোমরা কিয়ামতের দিনে নিজ আমলের পাল্লায় পাবে ও এর সমতুল্য অন্য কোন উল্লেখযোগ্য আমল পাবে না। (৭ম অধ্যায়, হজ্বের ভেদ ও নিষেধাজ্ঞা)

★ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন বায়তুল্লার তাওয়াফ নামাজের মতো। তবে ওতে কথা বলতে পারো। সেহেতু তার মাঝে যে কথাই বলুন ভালোকথা বলা উচিৎ। (জামে তিরমিজী-কিতাবুল হজ্ব, হাদিস-৯৬)

★ তাওয়াফেও নামাজের মতো শর্ত আছে।

● তাওয়াফের জন্য ওজু জরুরী। বস্ত্র পবিত্র হওয়া ও লজ্জাস্থল ঢাকা থাকা জরুরী।

● তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের পূর্বে নিয়ত করবেন।

● তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকবীর পড়ে ও ইস্তেলাম করে আরম্ভ করবেন।

● প্রতি চক্করের শেষে তাকবীর পড়ে ইস্তেলাম করবেন।

● যেভাবে সালাম ফিরে নামাজ শেষ করা হয় ঐভাবে তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ পড়ে তাওয়াফ পূর্ণ করা হয়। দুই চক্করের মাঝে ব্যবধান না হয়।

● তাওয়াফের সময় দৃষ্টি চলার স্থানে থাকবে।

● তাওয়াফ করার ক্ষেত্রে ক্বাবাগৃহের উপর দৃষ্টি দেওয়া মকরুহ। ইস্তেলাম করার সময় যদি দৃষ্টি ক্বাবার উপর পড়ে যায় কোন অসুবিধা নেই।

★ যদি তাওয়াফ করতে করতে নামাজের জামাত দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাওয়াফ বন্ধ করে নামাজ পড়ে নেবেন ও বাকী চক্করগুলি নামাজের পর পূর্ণ করে নেবেন।

যদি তাওয়াফের চার চক্করের পূর্বে আপনার ওজু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ওজু করে পূর্ণ তাওয়াফ অর্থাৎ ৭ চক্কর লাগিয়ে নেবেন। চার চক্করের পূর্বে ব্যবধান হয়ে গেছে এইজন্য এর গন্য হবে না।

★ তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে কেবল প্রথমবার তকবীর পড়ার সময় আপনার ছাতি ক্বাবার দিকে থাকবে। তারপর ক্বাবার দিকে ছাতি করা মকরুহ ও ক্বাবার দিকে পিছন্ন করা মকরুহে তাহরিমী অর্থাৎ হারামের নিকটবর্তী।

★ একটি চক্করের যতটা দুরত্ব ক্বাবার দিকে ছাতি বা পিছন্ন করে তাওয়াফ করেছেন পুনরায় পাল্টে করুন। ঐ দুরত্বটা তাওয়াফের চক্করে গন্য হবে না।

★ যে তাওয়াফের পর সায়ী করতে হয় তা প্রথম তিন চক্করে ইজতেবা ও রমল করতে হয়। এমন তিনবার হয়। ১ম উমরার তাওয়াফে। ২য় তাওয়াফে জিয়ারতে ও ৩য় ৮ই জিলহজ্ব যদি মীনায় যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফ ও সায়ী করেন।

৮ই জিলহজ্ব যদি তাওয়াফ ও সায়ী করে থাকেন তাহলে ১০ই জিলহজ্বের পর কেবল তাওয়াফ বিনা রমলে করবেন। তারপর সায়ী করার প্রয়োজন নেই।

রমল করা সুন্নত। যদি রমলওয়ালা তাওয়াফে রমল করতে ভুলে যান তাহলে সুন্নতের বিপরীত হবে। কিন্তু তাওয়াফ হয়ে যাবে। পুনরায় করার দরকার নেই। কিম্বা কেহ ৭ চক্করেই রমল করে থাকে ইহাও মকরুহ। তবে তাওয়াফ হয়ে যাবে।

★ তাওয়াফ হাতীমের বাইরে করবেন। কেননা হাতীম ক্বাবার অংশ। আর তাওয়াফ ক্বাবার বাইরে করা হয়।

★ রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে ৭০ হাজার ফেরেস্তা তাওয়াফকারীদের দোয়ায় আমীন বলতে থাকেন।

★ তাওয়াফের মাঝে কোন বিশেষ দোওয়া কিম্বা আয়াত পড়া ফরজ বা ওয়াজেব নয়। হজ্বের বই-এ যা কিছু লেখা হয়েছে কেবল সুন্নত। বুঝে দোওয়া চাওয়া বা যে দোওয়া কণ্ঠস্থ আছে সেগুলো পড়া উত্তম।

★ তাওয়াফের সওয়াব যেকোন ব্যক্তিকে পৌঁছাতে পারেন। মৃত হোক বা জীবিত। মক্কার নিকটে হোক বা দুরে।

★ দুর্বল বাহনের উপর বসে তাওয়াফ করতে পারেন।

★ ক্বাবাগৃহে প্রতিদিন ১২০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে ৭০টি তাওয়াফকারীর জন্য, ৩০টি নামাজীর জন্য ও বাকী ২০টি কেবল ক্বাবাগৃহকে দর্শনকারীর জন্য।

★ তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানীকে কেবল স্পর্শ করা সুন্নত। চুম্বন দেওয়া সুন্নতের বিপরীত। যদি ভীড় থাকে দুর থেকে অতিক্রম করে যাবেন, ইস্তেলাম করবেন না। রুকনে ইয়ামানীর কাছ থেকে ক্বাবার দিকে ছাতি করে স্পর্শ করা বা ভীড় করা সুন্নতের বিপরীত ও নিষেধ।

★ আসরের পর কাজা ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। এইজন্য আসরের পর হারামে খুব তাওয়াফ করুন কিন্তু শেষের দুই রাকাত ওয়াজেব নামাজ না পড়ে মগরিবের পর তাওয়াফের সংখ্যা অনুযায়ী দুই দুই রাকাত পড়ে নেবেন। এইভাবে হারাম শরীফে আপনার প্রতি সময় উত্তম ইবাদতে কাটবে।

★ কেবল তাওয়াফ করার সময় নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায়। এছাড়া মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে বা অন্য কোথাও অতিক্রম করা শুদ্ধ নয়। হারাম শরীফে যদি কারো সামনে দিয়ে বাধ্যতা অবস্থায় অতিক্রম করতে হয় কমপক্ষে ৪ ফুট দুরে বা সেজদার স্থানের বাইরে অতিক্রম করবেন।

উমরার অঙ্গ ও হজ্বের বর্ণনা

উমরার কেবল ২টি ফরজ ও ২টি ওয়াজেব। যে ব্যক্তি ঐগুলি পূর্ণ করবে তার উমরাহ পূর্ণ হবে।

এইরকম হজ্বের ৩টি ফরজ, ৮টি ওয়াজেব ও ১০টি সুন্নত আছে। যে ব্যক্তি ঐগুলি পূর্ণ করবে তার হজ্ব পূর্ণ হবে।

এই বই-এ সফরের পৃথক পৃথক অবস্থায় পৃথক দোয়া, জিকর ও নামাজের উল্লেখ করবো। এগুলি কেবল হজ্ব ও উমরার ইবাদতকে উৎকৃষ্ট করে তোলে। এগুলি না করায় কোন গোনাহ হবে না আর হজ্ব ও উমরার কোন ক্ষতিও হবে না।

(১) উমরার ফরজ

(১) মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা, নিয়ত করা ও তালবিয়া পড়া

(২) কাবাগৃহের তাওয়াফ করা ও তাওয়াফের পর দুই রাকাত তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ পড়া।

(২) উমরার ওয়াজেব

(১) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা।

(২) চুল ছোট করা বা মুণ্ডন করানো।

(৩) হজ্বের ফরজ

(১) এহরাম পরে অন্তরে হজ্বের নিয়ত করা ও তালবিয়া পড়া।

(২) আরাফাতে অবস্থান অর্থাৎ ৯ই জিলহিজ্জাহ জওয়ালের পর হইতে ১০ই জিলহজ্বের সকাল পর্যন্ত যেকোন সময় অবস্থান করা যদিও কিছুক্ষনের জন্যও হয়।

হুজুর (দঃ) বলেছেন, হজ্ব আরাফাতে অবস্থান করাকে বলা হয়। (জামে তিরমিজী, হাঃ ৮৮৯)

(৩) তাওয়াফে জিয়ারত যাহা ১০ জিলহিজ্জাহ সকাল থেকে আরম্ভ করে ১২ তারিখের মগবির পর্যন্ত করা হয়।

(৪) হজ্বের ওয়াজেব

(১) আরাফাতে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করা

(২) মুযদালফায় উপস্থিত হয়ে অবস্থান করা

(৩) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা

(৪) শয়তানকে ধারাবাহিক পাথর নিক্ষেপ করা

(৫) কুরবানী করা

(৬) মাথার চুল ছোট করা বা মুণ্ডন করানো

(৭) মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা

(৮) ১০, ১১ ও ১২ তারিখে মীনায় রাত্রি যাপন করা।

(৫) হজ্বের সুন্নত

(১) বহিরাগত কেবল হজ্বকারী ও উমরাহ সহিত মিলিত হজ্বকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুম করা

(২) ইমামের জন্য তিনস্থানে খুতবা পড়া (১) ৭ তারিখে মক্কায় (২) ৯ তারিখে আরাফাতে ও (৩) ১১ তারিখে মীনায়

(৩) ৯ তারিখের রাত্রিতে মীনায় অবস্থান করা

(৪) সূর্য্য উদয়ের পর ৯ তারিখে আরাফাতের জন্য রওনা হওয়া।

(৫) আরাফাত হইতে ইমামের রওনার পর রওনা হওয়া।

(৬) আরাফাত হইতে ফিরে মুযদালফায় রাত্রি যাপন করা।

(৭) আরাফাতে স্নান করা।

এ ছাড়া আরো অনেক সুন্নত আছে।

হজ্ব যাত্রায় রওনা হওয়ার পুর্ব্বে প্রস্তুতি

(১) ছয় থেকে আটজন দ্বীনদার লোকের একটি গ্রুপ তৈরি করে হজ্বের ফরম ভর্তি করুন। কেননা একটি কামরায় ছয় থেকে আট জনকে রাখা হয়। যদি সকলে সৎ ও এক চিন্তাধারার হয় তাহলে খুব সুবিধা হয়।

(২) অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে আমার অর্থ, আমার শক্তি ও আমার ক্ষমতা আমায় হজ্বে নিয়ে যায়নি বরং আমার আল্লাহ নিয়ে যাচ্ছেন। দুনিয়ায় অনেক ধনী আছেন, শক্তি-সামর্থও রাখেন কিন্তু আল্লাহর আদেশ না হওয়ায় তারা যেতে পারেন নি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছি যে হজ্ব কেবল আল্লাহর করুণায় করা হয় না বরং হজ্বের প্রতিটি করণীয় আল্লাহপাক নিজ করুণায় করিয়ে থাকেন। ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ লোকের সমাগমে যদি আল্লাহ পাকের সাহায্য না থাকতো আমিও আরো কয়েকজন হাজী আরাফতে ও মুযদালফায় সময়ে পৌঁছাতে পারতাম না আর এই কর্মগুলি আমাদের ছেড়ে যেত।

(৩) হাজীসাহেব বলানোর ইচ্ছা, ক্রয় ইত্যাদি করার নিয়ত যদি হজ্বের সঙ্গে গণ্য করে থাকেন তাহলে তওবা করে নিন। ও কেবল হজ্বের নিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে নিন।

(৪) ব্যবসা ও ঘরোয়া প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে ওসিয়ত লিখে দিন। নেওয়া, দেওয়ার যার যা হক বিস্তারিত বর্ণনা করে দিন ও কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও দ্বীনদারকে নিজের প্রতিনিধি করে যান।

(৫) আপনার অনুপস্থিতিতে পরিবারের লোকদেরকে নামাজ পড়তে থাকার ও দ্বীনের উপর চলার নসিহত করে যাবেন।

(৬) সদকার মাধ্যমে মসিবত দূর হয়। এই জন্য সফরে জান ও মালের রক্ষার জন্য আল্লাহর রাস্তায় দান করুন কিম্বা গরীবদের খাবার খাওয়াবেন।

(৭) যদি কারো হক না দিয়ে থাকেন তাহলে দিয়ে দিন। কোন ব্যক্তিকে দুঃখ দিয়ে থাকেন ক্ষমা চেয়ে নিন। আল্লাহ পাক মুখাপেক্ষীহীন। তাঁর হক ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু বান্দার হক ক্ষমা করবেন না। ওটা আপনাকে বান্দার কাছেই ক্ষমা করাতে হবে।

(৮) হজ্বের সফরের সকল সামগ্রীর একটা তালিকা তৈরি করে নিন। সেইমতো এক-দুদিন পূর্বে আপনার ব্যাগে ভরে নিন।

(৯) একটি পৃথক হাতব্যাগে পাসপোর্ট, উড়োজাহাজের টিকিট, পরিচয়পত্র ও অন্য প্রয়োজনীয় বস্তু রেখে দিন। এই ব্যাগটা এমন হয় যে ১৪ ঘন্টার সফরে সর্বদা আপনার কাছে রাখা সম্ভব হয়।

(১০) চুল পরিষ্কার করে নিন, নখ কেটে নিন ও স্নান করে ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যান।

★ ★ ★

হজ্ব যাত্রায় রওনা হওয়ার পূর্বে নিয়তের বর্ণনা

হজ্ব তিন প্রকারের হয়। আর হজ্বের সফরে হজ্বের সঙ্গে উমরাও করা হয়। তাহলে যখন আপনি বাড়ি থেকে এহরাম পরে বেরুবেন কিসের নিয়ত করবেন? উমরাহ? হজ্বের? ও কোন প্রকারের হজ্বের?

হজ্ব তিন প্রকারের। (১) হজ্বে ইফরাদ (কেবল হজ্ব)

(২) হজ্বে ক্বেরান (উমরাহ ও হজ্ব মিলিত)

(৩) হজ্বে তামাত্তো (উমরাহ ও হজ্ব পৃথক পৃথক)

হজ্বে ইফরাদে ইহরাম কেবল হজ্বের নিয়তে পরা হয় ও হজ্ব করে এহরাম খুলে দেয়। হজ্বে ক্বেরানে এহরাম হজ্ব ও উমরাহ দুটির নিয়তে পরা হয় ও দুটি করার পরই এহরাম খোলা হয়।

হজ্বে তামাত্তোয় প্রথমে উমরার নিয়তে এহরাম পরা হয়। ও উমরা করে এহরাম খুলে দেয়। পুনরায় ৮ই জিলহজ্ব হজ্বের নিয়তে এহরাম পরা হয় ও হজ্ব করে এহরাম খুলে দেয়। ভারতবাসীর জন্য হজ্বে তামাত্তো সহজ হয় এই জন্য আমরা তামাত্তো হজ্বের শিক্ষা নেবো।

এইজন্য যদি আপনার জাহাজ জেদ্দার জন্য হয় ও ৮ জিলহজ্বের পূর্বে হয় তাহলে আপনাকে মক্কা শরীফ পৌঁছে প্রথমে উমরাহ করতে হবে। এইজন্য আপনি এহরামও উমরার নিয়তে পরবেন ও নিয়তও উমরাহই করবেন।

যদি আপনার জাহাজ মদিনা শরীফের জন্য হয় তাহলে আপনি বাড়ি থেকে এহরামও পরবেন না আর কোন নিয়তও করবেন না। বরং মদিনার ৪০ ওয়াক্ত নামাজ পূর্ণ করে যখন মদিনা থেকে মক্কার জন্য রওনা হবেন তখন আপনাকে এহরাম পরে উমরার নিয়ত করতে হবে।

হজ্ব যাত্রার প্রারম্ভ

● ভালোভাবে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এহরাম পরে নিন।

● এই পবিত্র যাত্রার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চান। দোয়া বিশেষ প্রভাব রাখে যখন নফল নামাজ পড়ে চাওয়া হয়। এইজন্য দুই দুই রাকাত করে ১০ রাকাত নামাজ এইভাবে পড়বেন।

◆ দুই রাকাত নফল নামাজ সালাতুল হাজতের নিয়তে পড়ুন আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যে আপনার হজ্বের সফর সহজ, সরল ও কামিয়াব করুন। আপনার হজ্বকে মবরুর করুন।

◆ দুই রাকাত নফল নামাজ সালাতুল তৌবার নিয়তে পড়ুন। এই নফল নামাজের পর আপনি আল্লাহর দরবারে আন্তরিকতার সঙ্গে গোনাহ থেকে তৌবা করে নিন।

◆ দুই রাকাত নফল নামাজ কৃতজ্ঞতার জন্য পড়বেন। ও আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করুন যে তিনি আপনাকে এই পবিত্র সফরে যাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

◆ দুই রাকাত নফল নামাজ নিজের ও নিজের পরিবারের মসিবত হইতে মুক্তির নিয়তে পড়ুন ও দোয়া করুন। আল্লাহ পাক আপনাকে সফরে ও পরিবারকে স্বস্থানে শান্তিতে রাখুন ও রক্ষা করুন।

◆ শেষে দুই রাকাত নামাজ এহরামের নিয়তে পড়ুন। নফল নামাজ এহরামের চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে পড়বেন। ও শেষ দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে মাথা খুলে দেবেন কিন্তু উমরার নিয়ত এখনো করবেন না। উমরার নিয়ত জাহাজে ইয়ালামলাম অতিক্রম করার পূর্বে করলে সহজ হয়। ইয়ালামলাম মীকাত জেদ্দার ১ ঘন্টা পূর্বে আসে। জাহাজে কর্মীরা মীকাত আসার পূর্বে আপনাকে সচেতন করবেন।

● বোজর্গদের কাছ থেকে শুনেছি মানুষ এহরাম অবস্থায় যে কাজ করে সেটা হৃদয়ে অংকিত হয়ে যায় ও সারাজীবন ঐ কাজে লিপ্ত থাকে। এমনি তো সর্বঅবস্থায় গোনাহ হইতে বাঁচা দরকার কিন্তু এহরাম অবস্থায় গোনাহ হইতে খুব বাঁচা দরকার। পূর্ণভাবে সুন্নত অনুযায়ী দিবারাত্রি কাটানো দরকার।

● কিছু এমন গোনাহ আছে যেগুলির আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর গোনাহ হওয়ার অনুভূতিও নেই যেমন পরচর্চা ও কুদৃষ্টির গোনাহ ইত্যাদি। এই সকল গোনাহ আমরা ঐ সময় করি যখন বাস্তব আলোচনা করি ও বাজারে ঘোরাফেরা করি। এহরামের অবস্থায় ও হারামের সীমায় এই দুই কাজ থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন এবং যত বেশি সম্ভব কুরআন শরীফ পড়া, তাওয়াফ, নফল নামাজ ও ওজিফার মাধ্যমে কাটাবেন, আপনি যে স্থানে যাচ্ছেন (মক্কা শরীফ) ওখানে নেকির সাওয়াব একলক্ষ গুণ বেড়ে যায়। এইরকম একটি ভুলের গোনাহ এক লক্ষ হবে। হজরত নুহ (আঃ)-এর বয়স ৯৫০ বৎসর ছিল। যদি আপনি চারদিন হারাম শরীফে ইবাদত করেন তাহলে চার লক্ষ দিনের ইবাদতের সওয়াব পাবেন যাহা ১০০০ বৎসরে ইবাদতেরও বেশি। অর্থাৎ আপনি নুহ (আঃ) এর বয়সের চেয়ে আরো দীর্ঘকাল ইবাদত করেন। এ থেকে অনুমান করুন যে যদি আপনি এক মাস হারামে ইবাদত করেন কত সওয়াব পাবেন। এ সমস্ত ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান যারা এর গুরুত্ব বোঝেন ও এই সুবর্ণ সুযোগের সৎ ব্যবহার করেন।

● স্বদেশে যদি একটি ফরজ নামাজ ছেড়ে যায় তার গোনাহ ৭০টি কাবিরা গোনাহের সমতুল্য যার জাহান্নামের সাজা কয়েক লক্ষ বৎসর। এই গোনাহ যদি হারাম শরীফে হয়ে যায় একলক্ষ গুণ আরো বেড়ে যায়। নামাজ ছাড়া সহ যদি কেহ পরচর্চাও করে থাকে, কু-দৃষ্টির গোনাহও করে থাকে, ঝগড়া ইত্যাদিও করে থাকে ও পূর্ণ মাস করে, এই রকম মানুষ যখন হজ্বের সফরে রওনা হয় কিছুটা সৎ থাকে আর গোনাহের ভাগও তার বয়স অনুপাতে ৫০-৬০ বৎসরের হয়। কিন্তু যখন হজ্ব হইতে ফেরে কয়েক হাজার বৎসরের গোনাহ একত্রিত করে ফেরে। এইরকম হতভাগা মানুষ হাজির পরিবর্তে পাজী হবে না তো কি হবে? এইজন্য কিছু লোক বেদ্বীন হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আমায় আপনাকে ও সকল মুসলমানকে দ্বীন বোঝার ও তার উপর চলার তৌফিক দান করুন।

● ঐ পবিত্র স্থান যাকে দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ চক্ষু কাতর হয়ে থাকে ওখানে আপনাকে কেবল ৪০ দিন থাকতে হবে। এই ৪০ দিনের জন্য যদি আপনি ব্যবসায়ীক নেওয়া দেওয়া ছেড়ে দেন তাহলে কি কিয়ামত এসে যাবে? বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার সময় আপনার নেওয়া দেওয়া ছেড়ে হজ্বের সফরে রওনা হয়ে যান ও আগামী প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য সম্পদ মনে করুন ও যত নেকি নিজের ঝোলায় একত্রিত করতে পারেন করে নিন। মৃত্যুর সংবাদ কে জানে? হতে পারে এটা আপনার শেষ সফর?

● স্টিলের কড়াটি পরে নেবেন। পাসপোর্ট, জাহাজের টিকিট ও দ্বিতীয় অন্য প্রয়োজনীয় বস্তু হাত ব্যাগে কাঁধে ঝুলিয়ে নেবেন। সকল সামানের উপর নিজের নাম, ঠিকানা ও কভার নং পুনরায় একবার যাচাই করে নিন। পরিবারের জন্য আল্লার কাছে দোয়া চান যে আল্লাহ তাদেরকে শান্তিতে রাখেন ও এই দোয়া পড়বেন।

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ، زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ.

অর্থ ঃ— তুমি ভালোভাবে যাও। তোমার দ্বীন, তোমার দ্বীন ও দুনিয়ার আমানত, তোমার কাজের পরিণতি আল্লাহর অধীনে। আল্লাহপাক তোমার খোদাভীতির দৌলত দান করুন ও তোমার জন্য নেককর্ম সহজ ও সরল করুক, তুমি যেখানেই থাকো।

● বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ—আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি আমার ইমান আল্লাহর উপর ও তাঁরই উপর ভরসা রাখি। এটা ধ্রুবসত্য যে তার আদেশ ছাড়া গাছের একটা পাতাও হেলে না। আমি আল্লাহর সাহায্যে সফর আরম্ভ করছি।
যানবাহন এসে গেলে তার উপর সুন্নত অনুযায়ী বসবেন।

● যানবাহনের উপর চড়ার সুন্নত পদ্ধতি

হজরত আলী ইবনে রাবিয়া হইতে বর্ণিত, যে হজরত আলী ইবনে আবিতালিবের নিকট যখন বাহন আনা হলো আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন তার রেকাবে (পাদানি) পা রেখেছিলেন বিসমিল্লাহ পড়েছিলেন, পুনরায় যখন পীঠে বসেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েছিলেন ও পুনরায় এই দোয়া পড়েছিলেন—

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ
وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থ ঃ—ঐ আল্লাহর প্রশংসা করি যিনি আমাদের জন্য একে অনুগত করেছেন। আমাদের এ শক্তি ছিলো না। আমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।
তারপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ ও তিনবার আল্লাহু আকবর পড়েন ও এই দোয়া পড়েন—

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

অর্থ ঃ—তুমি পবিত্র নিঃসন্দেহে আমি আমার অন্তরের উপর অত্যাচার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো তুমি ছাড়া কেহ ক্ষমা করতে পারেনা।
এই দোয়া পড়ে হেঁসেছিলেন। লোক জিজ্ঞাসা করে হে আমীরুল মোমেনীন (মুসলিম সর্দার) আপনি হাঁসছেন কেন? তিনি বলেন আমি আল্লাহর রসুল (দঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছিলাম যেমন আমি করেছি। আর যখন তিনি হেঁসেছিলেন আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আপনি কোন কথার উপর হাঁসছেন? তিনিই উত্তর দিয়েছিলেন, তোমাদের প্রতিপালক পবিত্র। তাঁর বান্দা যখন বলে হে প্রভু তুমি আমায় ক্ষমা করো তখন তিনি সন্তুষ্ট হন যে আমার বান্দারা অবগত আছে যে আমি ছাড়া আর কেহ ক্ষমা করতে পারেনা। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

● এয়ারপোর্টে পৌঁছে সময় নষ্ট না করে ভিতরে প্রবেশ করে যান। প্রথমে আপনাকে সৌদি রিয়াল (টাকা) দেওয়া হবে। এটা আপনি সাবধানতার সঙ্গে হাত ব্যাগের ভিতরের পকেটে রেখে দিন। কেননা যদি বারবার ব্যাগ খোলার প্রয়োজন হয়, টাকা পড়ে যাওয়ার বা হারিয়ে যাওয়ার কোন রকম আশংখা না থাকে।

● সৌদি রিয়াল দেওয়ার পর আপনার লাগেজের (সামগ্রী) সিকিউরিটি চেক করা হবে। পুনরায় ওজন করা হবে। তারপর আপনার লাগেজ জাহাজে তোলার জন্য নিয়ে যাবে। আপনাকে জাহাজে চড়ার পূর্বে বিশ্রামগৃহে (Waiting Hall) অপেক্ষা করতে বলা হবে। ওখানে আপনি প্রস্রাব, পায়খানার প্রয়োজন সেরে ওজু করে নিন। হজ্বকমেটির পক্ষ থেকে নামাজেরও ব্যবস্থা থাকলে নামাজও পড়ে নিন।

● জাহাজের সফর সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টায় হয়। জাহাজে বাথরুম আছে তবে অপবিত্র হওয়ার ভয় থাকে আর ওজুর ব্যবস্থা থাকে না। এই জন্য প্রথম থেকে তৈরী থাকবেন।

● যখন জাহাজে চড়ার ঘোষনা করা হবে, চড়ার দোয়া পড়তে পড়তে জাহাজে প্রবেশ করবেন। আর যখন জাহাজ রওনা হবে এই দোয়া পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ ঃ— জাহাজ চলা ও থামা আল্লাহরই নামের বরকতে। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক ক্ষমাকারী ও করুণাময়।

উড়োজাহাজে সফর ও মক্কা শরীফে আগমন

উড়োজাহাজে সফর সাড়ে চার ঘণ্টার। সফরের মাঝে কোল্ডড্রিঙ্ক, খাবার ও খুশবুওয়ালা কাগজের রুমাল ইত্যাদি আপনাকে দেওয়া হবে। যদি আপনি সফর আরম্ভ করার পূর্বে উমরার নিয়ত করে নেন তাহলে খুশবুওয়ালা শরবত (Cold drink) খুশবুওয়ালা রুমাল ও খুশবুওয়ালা খাবার হইতে দুরে থাকুন। কেননা এহরাম অবস্থায় খুশবু লাগানো ও খাওয়া দুটোই নিষিদ্ধ। যদি উমরার নিয়ত না করে থাকেন নির্বিঘ্নে খেতে পারবেন।

তিনঘণ্টা সফর করার পর নিয়তের প্রস্তুতি করুন। মীকাত আসার পূর্বে আপনাকে জাহাজের কর্মীরা সংবাদ দেবে। মীকাত এলে উমরার নিয়ত এইভাবে করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ আমি উমরার নিয়ত করছি। তুমি আমার জন্য সহজ ও গ্রহণ করো। নিয়তের পর পুরুষ উচ্চ আওয়াজে ও মহিলা নীরবে তিনবার তালবিয়া পড়বেন।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

অর্থ ঃ— উপস্থিত হয়েছি, আমার প্রভু আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি।

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

আমি উপস্থিত হয়েছি, আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি উপস্থিত হয়েছি।

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،

সর্ব্বপ্রকার প্রশংসা ও গুনগানের আপনিই যোগ্য। সকল নিয়ামত আপনারই। সারা বিশ্বে আপনারই আদেশে চলে ।

لَا شَرِيْكَ لَكَ আপনার অংশীদার ও সমতুল্য কেহ নাই।

নিয়তকরা ও তালবিয়া পড়ার সাথে সাথে এহরামের সকল নিষেধাজ্ঞা আপনার উপর এসে যায় এরপর আপনার জন্য সর্ব্বউৎকৃষ্ট তাসবীহ তালবিয়া পড়া

যে উড়োজাহাজ হাজ্বীদেরকে নিয়ে যায়, কর্মীরা খেয়াল রাখে, মুসাফিরদের মীকাতের সংবাদ দেওয়ার কিন্তু যেগুলো সাধারণ উড়োজাহাজ তাতে মীকাতের সংবাদ দেওয়ার কোন খেয়াল রাখে না এই জন্য যদি আপনি টুরের মাধ্যমে সাধারণ জাহাজে যান সাবধানতার জন্য সফরের দুই ঘণ্টা পর নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে নেবেন।

জেদ্দা পৌঁছে জাহাজ থেকে নেমে বাসের মাধ্যমে আপনাকে এয়ারপোর্টের বিল্ডিং-এ নিয়ে যাওয়া হবে। এয়ারপোর্টের বিল্ডিং -এ প্রবেশ করার পর আপনাকে তিনটি স্থান দিয়ে অতিক্রম করতে হবে

★ প্রথম স্থানে আপনাকে একটি গ্রিলে ঘেরা হল ঘরে রাখা হবে ও আপনার পাসপোর্টে প্রবেশের স্ট্যাম্প লাগানো হবে।

★ দ্বিতীয় স্থানে আপনাকে পাশের অন্য একটি হল ঘরে আপনার সামগ্রী চিনে আপনাকে একত্রিত করতে হবে ও তার সিকিউরিটি যাচাই করাতে হবে। যাচাইয়ের পর আপনার সামগ্রী পুনরায় নিয়ে নেওয়া হবে ও বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছানো হবে।

★ তৃতীয় স্থানে আপনাকে আনুমানিক ২০০মিটার দূরে ভারতবাসীর বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে হবে। জেদ্দার ইয়ারপোর্ট অনেক বড়। হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে এই জন্য সাথীদের সঙ্গে থাকলে বোর্ড দেখতে দেখতে যাবেন। রাস্তায় গাইড দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন জিজ্ঞাসা করে ভারতের বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছাবেন। এখানে প্রস্রাব, পায়খানার প্রয়োজন পুরো করতে পারেন। ওজু নামাজ পড়ার সুবিধা আছে। এই জন্য প্রয়োজন মিটিয়ে নামাজ পড়ে নেবেন। যাচায়ের পর যে সামান আপনার নেওয়া হয়েছিল কুলিরা এখানে পৌঁছে দেয়। আপনার সামান চিনে একত্রিত করুন ও কাউণ্টারে আপনার পাসপোর্ট দেখান।

এখানে আপনাকে গ্রুপের মাধ্যমে মুআল্লিমের অধীনে করা হবে। মুআল্লিম একটি বাসে যতলোক চড়তে পারে একত্রিত করবেন। তাদের সামান একটি ট্রলিতে রেখে বাস পর্যন্ত নিয়ে যাবেন ও বাসে চড়িয়ে দেবেন। আপনি এটা স্মরণ রাখবেন আপনি ঐ বাসেই চড়বেন যাতে আপনার সামান রাখা হয়েছে। বাসে চড়ার সময় মুআল্লিম আপনার পাসপোর্ট নিয়ে নেবেন ও মক্কা শরীফে আপনার বাসস্থানে পৌঁছে আপনার বাসস্থানের কার্ড, পরিচয়পত্র ও প্লাস্টিকে পাট্টা হাতে পরার জন্য দেবেন।

এয়ারপোর্টে ও বাসে প্রতিস্থানে তালবিয়ার জেকের পড়তে থাকবেন। যখন বাস মক্কা শরীফের সীমায় প্রবেশ করবে এই দোয়া পড়বেন।

হে আল্লাহ ইহা আপনার ও আপনার রসুলের (দঃ) পবিত্র স্থান। এখানে জন্তুদেরও শান্তি দেওয়া হয়েছে। এই রকম পবিত্র স্থানের বরকতে আমার রক্ত, মাংস ও হাড়কে জাহান্নামের আগুন থেকে আমায় নিষ্কৃতি দাও আমায় তোমার প্রিয়জনের মধ্যে গন্য করো।

যখন মক্কা শহর প্রথম নজরে পড়বে এই দুয়া পড়বেন।

হে আল্লাহ, মক্কা শহর আমার জন্য ঠিকানা করে দিন ও হালাল রুজি দিন।

হে আল্লাহ আমায় মক্কা শহরে বরকত দান করুন।

হে আল্লাহ মক্কাবাসীকে আমার দৃষ্টিতে প্রিয় করে দিন।

হে আল্লাহ আমাকেও মক্কাবাসীর দৃষ্টিতে প্রিয় করে দিন।

বাস আপনাকে মক্কার বাসস্থানে পৌঁছেদেবে। কুলিরা আপনার সামগ্রী বাস থেকে আপনার কামরা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সামগ্রী রেখে কিছু খেয়ে নিন। প্রয়োজন হয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিন। যে রিয়াল আপনি এয়ারপোর্টে পেয়েছেন সুটকেশে রক্ষিত করুন। নিজের সঙ্গে হারামে মোটেই নিয়ে যাবেন না। পুনরায় উমরার প্রস্তুতি করুন। মক্কায় পৌঁছানোর পর আপনি যতশীঘ্র উমরা করবেন ততই উত্তম।

হজ্বে ও রমজান মাসে নামাজের সময় ও নামাজের পর তাওয়াফে খুব ভিড় থাকে। এইজন্য উমরার কাজ পূর্ণ করতে পেরেশান হতে হয়। সকালে ইশরাকের পর ও রাত্রিতে ইশা ও খাওয়ার পর হারাম শরীফে কিছুটা খালি থাকে, সুতরাং ঐ দুই সময়ে আপনি যদি উমরা করেন কিছুটা সহজ হবে।

১. ক্বাবা গৃহের ভিতরের মেঝে তাওয়াফস্থল হইতে সাতফুট উচ্চতা। ক্বাবাগৃহের মোট উচ্চতা ৪৬ ফুট। দৈর্ঘ্য ৪২ ও প্রস্থ ২৮ ফুট। হাতীমের শেষ কোণা ক্বাবাগৃহ হইতে ২১ ফুট দুরত্ব।

২. মাক্বামে ইব্রাহীম একটি পাথর। যার উপর হজরত ইব্রাহীমের পায়ের চিহ্ন আছে। এর উচ্চতা ৮ ইঞ্চি । চওড়া ১৪ ইঞ্চি ও লম্বা ১৫ ইঞ্চি । ক্বাবাগৃহ হইতে ৪৬ ফুট দুরে আছে। এর রং লাল ও হলুদের সাদা রং মিশ্রিত।

৩. হাজারে আসওয়াদ ক্বাবাগৃহের পূর্ব কোণে মেঝে থেকে আনুমানিক সাড়ে ৪ ফুট উঁচুতে লাগানো আছে। এটা কোন কারণে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এর আটটি অংশ 7 x 10 ইঞ্চি কালো পাথরের উপরে জুড়ে রুপোর ফ্রেমে লাগানো হয়েছে। হজরত ইব্রাহীমের সময়ে সাদা ছিল। লোকের গোনাহের কারণে কালো হয়ে গেছে।

৪. জমজমের কূপ বর্তমানে মেঝের নীচে আছে। ওর পানির স্তর মেঝে থেকে ১২ ফুট নীচে। পানির ধারা ৪০ ফুট নীচে। কূপের মোট গভীরতা ১০০ ফুট। কূপের পরিধি ৬ ফুট। ক্বাবাগৃহ হইতে ৬০ ফুট দুরত্বে জমজমের কূপ অবস্থিত।

৫. মসজিদে হারামের তুর্কী নির্মাণ। মাতাফ ও তুর্কী নির্মাণের পরিধি ২৯০০০০ বর্গফুট।

৬. সৌদী আমলের মসজিদে হারামের নতুন বিল্ডিং মেঝের নীচের অংশ সহ ১৩১০০০০ বর্গফুট। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ৩০ ফুট।

৭. মসজিদে হারামের প্রথম তলা ও ছাদের উচ্চতা ৩০ ফুট ও পরিধি ৪২০০০০ বর্গফুট।
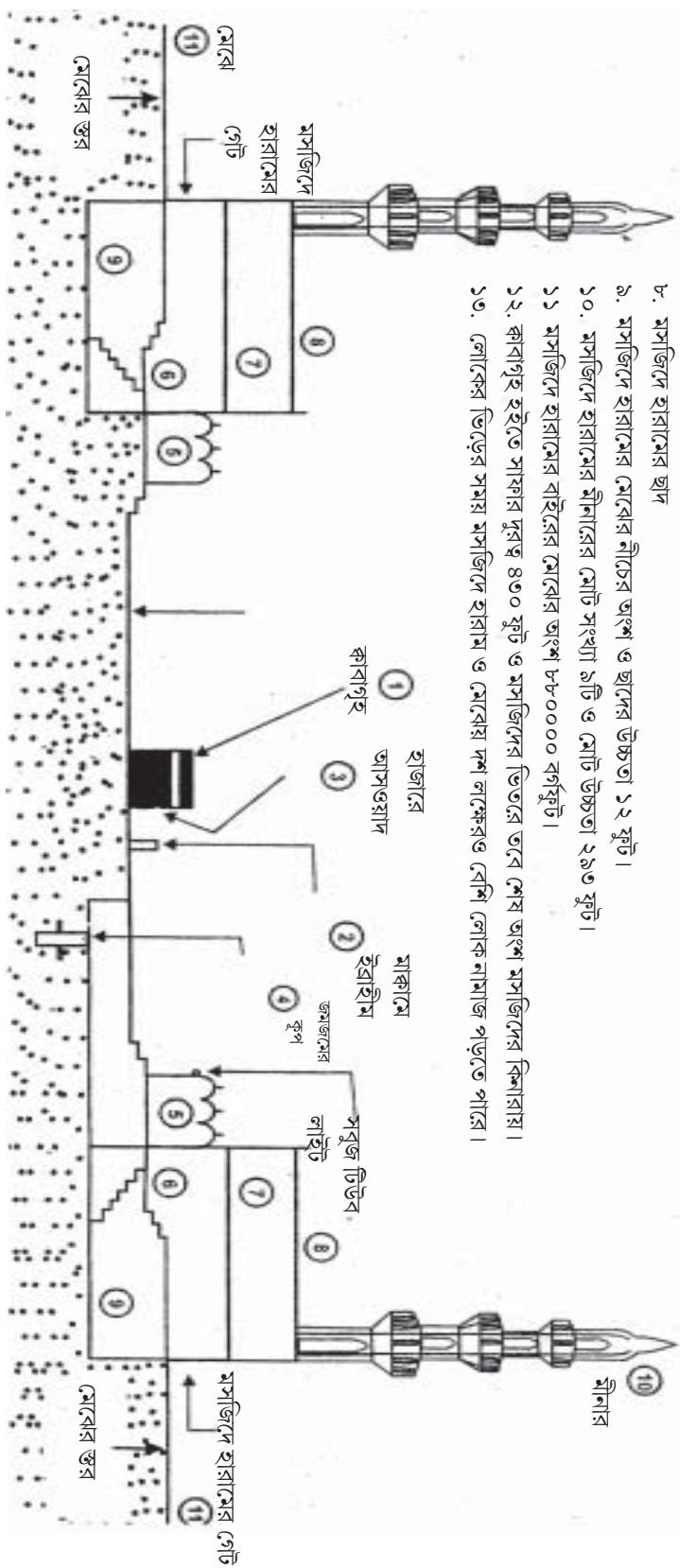
৮. মসজিদে হারামের ছাদ

৯. মসজিদে হারামের মেঝের নীচের অংশ ও ছাদের উচ্চতা ১২ ফুট।

১০. মসজিদে হারামের মীনারের মোট সংখ্যা ৯টি ও মোট উচ্চতা ২৯৩ ফুট।

১১ মসজিদে হারামের বাইরের মেঝের অংশ ৮৮০০০০ বর্গফুট।
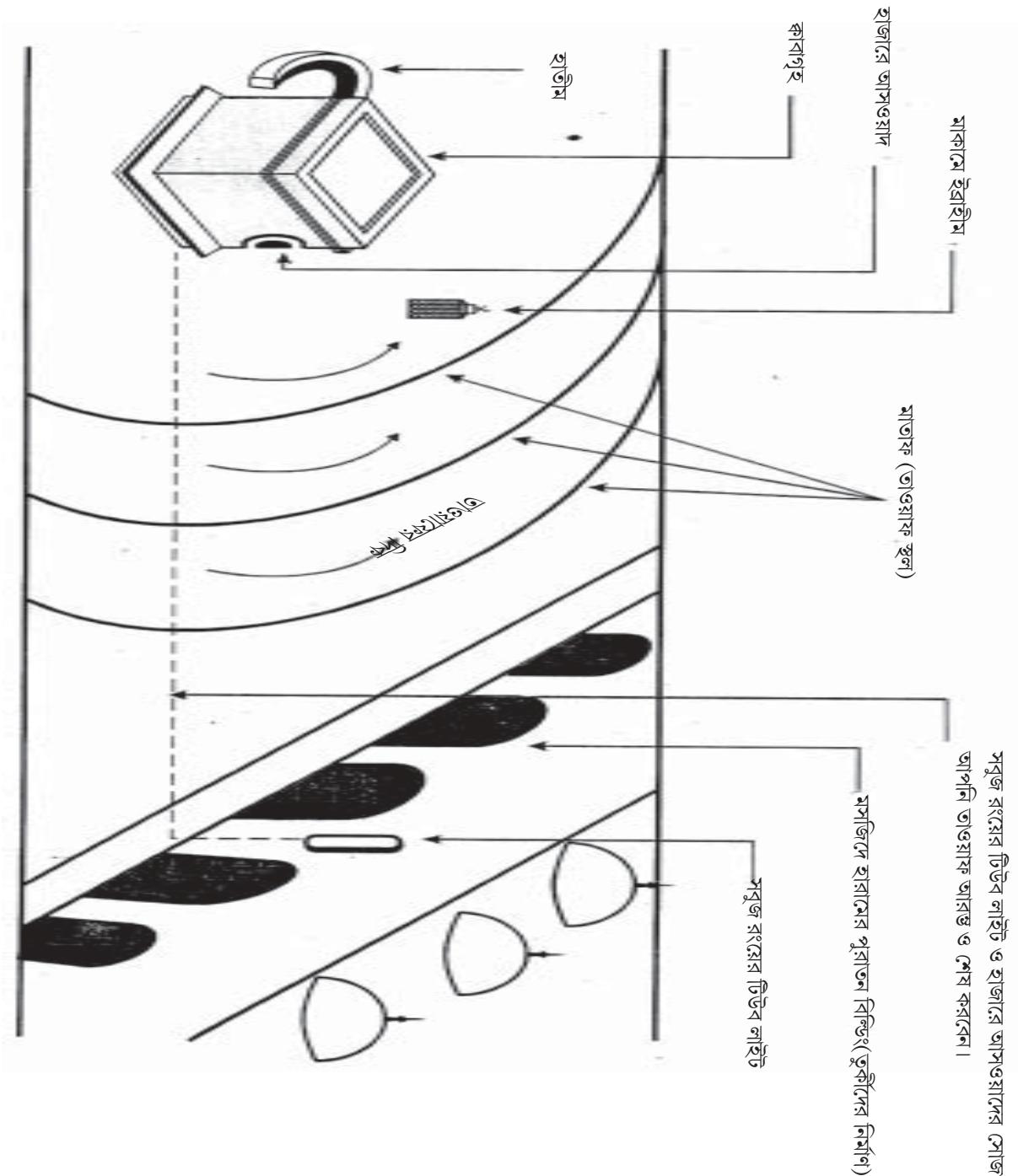
১২. ক্বাবাগৃহ হইতে সাফার দুরত্ব ৪৩০ ফুট ও মসজিদের ভিতরে তবে শেষ অংশ মসজিদের কিনারায়।

১৩. লোকের ভিড়ের সময় মসজিদে হারাম ও মেঝেয় দশ লক্ষেরও বেশি লোক নামাজ পড়তে পারে।

ক্বাবাগৃহ ও তাওয়াফস্থলের চিত্র

উমরাহ কিভাবে করবেন

মসজিদে হারামে প্রবেশ

ক্বাবাগৃহের চতুর্পাশে যে উচ্চ সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করা আছে ওকে মসজিদে হারাম বলা হয়। ওতে ১০০-র অধিক দরজা আছে। হুজুর (দঃ) এর ঘর মারওয়ার উত্তর পূর্ব দিকে ছিলো। হুজুর (দঃ) বাবুল সালাম দিয়ে যা সাফা ও মারওয়ার মাঝে অবস্থিত প্রবেশ করতেন এই জন্য যদি সম্ভব হয় বাবুল সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন। নচেৎ যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারেন। মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দোওয়া পড়বেন।

অর্থ ঃ— আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠাচ্ছি।

পুনরায় ডান পা মসজিদে প্রবেশ করে পড়ুন—

رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَافْتَحْ لِیْ، اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ

অর্থ ঃ— হে আমার প্রভু আমার গোনাহ ক্ষমা করো ও আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দাও।

প্রথম নজর ও দোওয়া

ক্বাবা শরীফে প্রথমবার যখন আপনার দৃষ্টি পড়বে চোখের পাতা পড়ার পূর্বে যাই দোয়া চাইবেন আল্লাহপাক অবশ্যই কবুল করবেন। এইজন্য এটা খুবই অমুল্য মুহূর্ত। এ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রথম থেকে প্রস্তুতি নিন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় দৃষ্টি নিচে রাখবেন। আনুমানিক ২০০ পা আগে বেড়ে যাবেন। এর মাঝে আপনাকে দুবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। যখন আপনি চাতালে পৌঁছাবেন রাস্তার এক সাইডে দাঁড়িয়ে নজর তুলে আল্লাহর ঐ পবিত্র ঘরকে দেখবেন যার দিকে মুখ করে আপনি সারাজীবন সিজদা করতে থাকেন। ক্বাবাগৃহের উপর দৃষ্টি জমিয়ে রাখুন ও চোখের পাতা না ফেলে এই দোয়া পড়ুন

হে আল্লাহ এরপর আমি যা কিছু নেক দোয়া চাইবো তুমি কবুল করো। তারপর তিনবার এই দোয়া পড়ুন—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ ঃ— আল্লাহ সর্ব্বউচ্চ। আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই।

দোয়ার পরিবর্তে আপনি তকবিরও পড়তে পারেন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

অর্থ ঃ—আল্লাহ সর্ব্বউচ্চ। আল্লাহ সর্ব্বউচ্চ। আল্লাহ ব্যতিত কোন মালিক নেই ও আল্লাহ সর্ব্বউচ্চ। আল্লাহ সর্ব্বউচ্চ। সবরকম প্রশংসা কেবল আল্লাহর। তারপর দরুদশরীফ পড়ুন ও অন্তর ভরে দোয়া চান। এটা দাতার দরবার। আপনি চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন কিন্তু তিনি দিতে ক্লান্ত হবেন না। নিজের জন্য, পিতা মাতার জন্য, আত্মীয় স্বজনদের জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য, বিশ্বের মুসলিমদের জন্য, নিজের দেশের জন্য ও প্রত্যেকের জন্য আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে চান।

উমরার দুইটি ফরজ। একটি ফরজ এহরাম পরে আপনি আদায় করেছেন এখন দ্বিতীয় ফরজ (তাওয়াফ) আদায় করা। তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে ও হাজরে আসওয়াদেই শেষ হবে। হাজরে আসওয়াদ ক্বাবা শরীফের পূর্ব কোণে লাগানো একটি জান্নাতি পাথর। যার চতুর্দিকে রূপোর ফ্রেম তৈরী করা আছে। তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে ও চুম্বন দিয়ে আরম্ভ করতে হয় কিন্তু লোকের ভীড়ের জন্য এটা সম্ভব হয় না এইজন্য সহজ ও সরল পদ্ধতিতে উমরার পদ্ধতি বর্ণনা করবো।

তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদকে নিকট থেকে বা দুর থেকে চুম্বন দিয়ে আরম্ভ করা যায়। হাজরে আসওয়াদের সোজা চিহ্নের অনুমান করার জন্য পূর্বদিকে তাওয়াফস্থলে দেওয়ালে ও পাশের মসজিদে হারামের ছাদে ও টেরিসের (Terrace) খাম্বায় সবুজ রং এর টিউব লাইট লাগানো আছে। ঐ চিহ্নের মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদের সোজা নির্ণয় করতে পারেন। আপনার তাওয়াফ ঐ চিহ্ন থেকে আরম্ভ হবে ও ওখানেই শেষ হবে।

প্রথম দৃষ্টি দেওয়ার পর আপনি হাজরে আসওয়াদ ও সবুজ টিউব লাইটের সোজা এসে যান ওখানে পৌঁছানোর পর লোকেদের বিপরীতদিকে না চলে তাওয়াফকারীদের সঙ্গে জুড়ে যান ও তাদের সঙ্গে চলতে চলতে হাজরে আসওয়াদ ও সবুজ টিউব লাইটের মাঝে পৌঁছে যান।

রমল

এক তাওয়াফ পূর্ণ করার জন্য ক্বাবাশরীফের পাশে ৭ বার চক্কর লাগাতে হয় ও দুই রাকাত তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ পড়তে হয়। উমরার তাওয়াফকে ও হজ্বের তাওয়াফকে জিয়ারতে পুরুষদের জন্য প্রথম তিন চক্করে পালোয়ানের মত গর্বের সঙ্গে ছোট ছোট পা রেখে একটু দ্রুত চলতে হয়, একে রমল বলা হয়। রমল করার সময় ডান হাতের কাঁধ খোলা থাকে। একে ইজতেবা বলা হয়। ইজতেবার জন্য এহরামের একটি অংশ ডান হাতের বগলের নিচে দিয়ে বার করে বাম হাতের কাঁধের উপর রেখে নেবেন। নফল তাওয়াফে রমল ও ইজতেবা কিছু করা হয় না।

তাওয়াফের প্রথম চক্কর

লোকের ভিড়ের মধ্যে যখন আপনি তাওয়াফ করতে করতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছাবেন হাজরে আসওয়াদ ও সবুজ টিউব লাইটের সোজা মধ্যবর্তী স্থানে আধফুট পূর্বে থেমে যান ও হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে তাওয়াফের নিয়ত এইভাবে করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ ، سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى ، فَيَسِّرْهُ لِي ، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي.
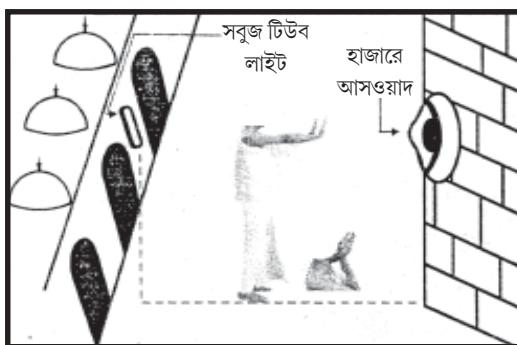
অর্থ ঃ— হে আল্লাহ আমি আপনার এই সম্মানীয় ঘরের তাওয়াফ, আপনার সন্তুষ্টির জন্য করছি। আপনি আমার জন্য ইহাকে সহজ ও কবুল করুন।

নিয়ত করার পর আপনি ডানদিকে এতটা সরে যাবেন যে হাজরে আসওয়াদ ও সবুজ লাইটের একেবারে মাঝে এসে যাবেন ও পুনরায় নিম্নলিখিত তকবীর পড়তে পড়তে কাঁধ পর্যন্ত এইভাবে হাত তুলবেন যেমন নামাজে তুলা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আমি আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সর্বরকম প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য।

তকবীর পড়ার পর হাত ছেড়ে দিন। হাজরে আসওয়াদের দিকে দুটি হাতের কব্জি কাঁধ পর্যন্ত এমনভাবে বাড়িয়ে দিন যেন আপনি হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছেন। পুনরায় হাতে চুম্বন দিন। এই কাজটি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার সমতুল্য আর একে ইস্তেলাম বলা হয়। ইস্তেলামের পর আপনি তাওয়াফ করার দিকে ঘুরে যান ও তাওয়াফ আরম্ভ করে দিন।
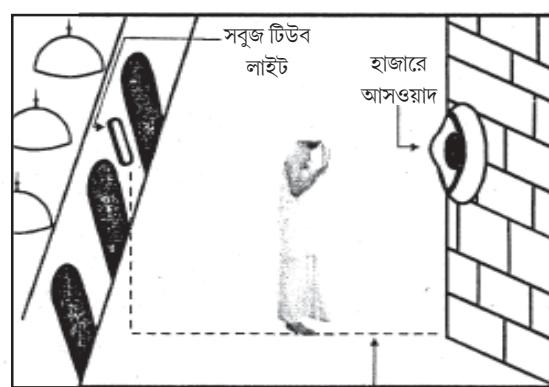
তকবীর পড়ার পর হাত ছেড়ে দিন। যদি হাজরে আসওয়াদ নিকটে হয় তাহলে চুম্বন দিন। যদি দূরে হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত বাড়িয়ে হাতে চুম্বন দিন ও তাওয়াফ শুরু করুন।

ক্বাবা শরীফের চারটি কোণ আছে। তাওয়াফ করার সময় প্রথম কোণ যেখানে হাজরে আসওয়াদ লাগানো আছে, তৃতীয় কোণ পর্যন্ত তৃতীয় কলমা পড়বেন।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

অর্থ ঃ— আল্লাহ পবিত্র। সর্বরকম প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ সর্বোচ্চ। গোনাহ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা ও ইবাদতের দিকে ধাবিত হওয়ার শক্তি কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া যায়।

হাজরে আসওয়াদ ও সবুজ লাইটের সোজা আধ ফুট পূর্বে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে নিয়ত করুন পুনরায় হাজরে আসওয়াদের একেবারে সামনে এসে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে কান পর্যন্ত হাত তুলে তকবীর পড়ুন।

ক্বাবা শরীফের চতুর্থ কোণ যাকে রুকনে ইয়ামনী বলা হয়, এখান থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত নিম্নের দোয়া পড়বেন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ— হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে তুমি ইহকালে কৃতকার্য কর ও পরকালেও কৃতকার্য কর। আর দোযখের আগুন থেকে তুমি পরিত্রাণ দাও।

রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে ৭০ হাজার ফেরেস্তা তাওয়াফকারীদের দোয়ায় আমীন (কবুল করো) বলতে থাকে। এই দোয়াটি যেটি কোরআন শরীফের ১টি আয়াত। তা পড়া উত্তম।

উপরে তাওয়াফের দুটি দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি তাওয়াফের সহজ দোয়া। আপনি হজ্বের বইএ প্রতি তওয়াফের চক্করের পৃথক পৃথক ও বড় বড় দোয়া দেখতে পাবেন। আপনি ঐগুলিই পড়তে পারেন। যাই পড়ুন বুঝে পড়ুন ও বই না দেখে পড়ুন। ঐ দোয়াই প্রভাব রাখে যে দোয়া বুঝে অন্তর থেকে পড়া হয়। তাওয়াফের অবস্থায় বই দেখে পড়লে অপরের অসুবিধা হয়।

তাওয়াফ অবস্থায় ক্বাবার দিকে মুখ করা মকরুহ। আর পিছন করা মকরুহে তাহরিমী যাহা হারামের নিকটবর্তী। এইজন্য তাওয়াফ অবস্থায় সোজা চলবেন ও দৃষ্টি নিচে রাখবেন।

তাওয়াফের দ্বিতীয় চক্কর

রুকনে ইয়ামানী থেকে দোয়া পড়তে পড়তে যখন আপনি হাজরে আসওয়াদ ও সবুজ টিউব লাইটের সোজা কালো পট্টির উপরে পৌঁছাবেন। ছাতি না ফিরিয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে কেবল মুখ করে নেবেন ও হাতের কব্জি হাজরে আসওয়াদের দিকে করে নেবেন ও তকবীর পড়তে পড়তে চুম্বন দিয়ে নেবেন।

দ্বিতীয় থেকে শেষ চক্কর পর্যন্ত কেবল মুখ হাজরে আসওয়াদের দিকে করবেন ও হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত বাড়িয়ে চুম্বন দেবেন। পূর্ণভাবে ক্বাবা শরীফের দিকে ফিরবেন না।

তকবীর

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

হাজরে আসওয়াদের দিকে ছাতি ও মুখ করে কেবল তাওয়াফের প্রথম চক্করের আরম্ভে নিয়ত, তকবীর ও ইস্তেলাম করা হয়। তারপর প্রতি চক্করের আরম্ভে কেবল মুখ ও হাত হাজরে আসওয়াদের দিকে করতে হয়। আপনার ছাতি তাওয়াফের দিকে থাকবে।

ইস্তেলামের পর পূর্বের মতো রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত তৃতীয় কলমা পড়ুন ও রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত উল্লেখিত দোয়া পড়ুন। এইভাবে ৭ চক্কর পূর্ণ করুন।

হাতে ৭ দানাওয়ালা তাসবীহ রাখুন ও প্রতি চক্কর একটি দানা কম করতে থাকুন ও চক্করের গণনা করতে থাকুন। সপ্তম চক্কর পূর্ণ হলে তকবীর পড়তে পড়তে হাজরে আসওয়াদকে ইস্তেলাম করুন। (এটা আপনার অষ্টম ইস্তেলাম হবে) ও ডান কাঁধ যাহা এখনও পর্যন্ত খোলা ছিল তা ঢেকে নিন ও মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে এসে যান। এদিকে কাবা শরীফের দরজা আছে। তাওয়াফকারীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দুই রাকাত তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ পড়ুন। এতদূর পর্যন্ত আপনার তাওয়াফ পূর্ণ হলো ও উমরার দ্বিতীয় ফরজও পূর্ণ হলো।

জমজম পানকরা

দুই রাকাত তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ পড়ে খুব ছোট করে জমজম পান করুন। পানি দাঁড়িয়ে ও কেবলার দিকে মুখ করে বিসমিল্লাহ পড়ে পান করুন ও পানি পান করার পর এই দোয়া পড়ুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا، وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ, আমায় লাভদায়ক জ্ঞান দান করো। রুজিতে প্রশস্ততা দাও ও সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি দাও।

হজরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত, যে জমজমের পানি এইজন্য, যার জন্য পান করা হয়। অর্থাৎ যে নিয়তে পান করা হয় আল্লাহপাক তার নিয়ত পূর্ণ করেন।

জমজম পান করার পর পুনরায় সবুজ লাইটের মাঝে সোজা আসুন ও আর একবার হাজরে আসওয়াদের দিকে তকবীর পড়ুন ও ইস্তেলাম করুন। এটা আপনার নবম ইস্তেলাম হবে। ইস্তেলামের পর সবুজ টিউব লাইটের দিকে ক্বাবা শরীফ থেকে দূরের দিকে চলতে থাকুন। এইভাবে আপনি সাফায় পৌঁছে যাবেন।

সাফা ও মারওয়াহের সায়ী

সাফা ও মারওয়াহ পূর্বে দুটি পাহাড় ছিলো। বর্তমানে কেবল একটু উঁচু রয়েছে। সরকার সাফা, মারওয়াহ ও মাঝের সকল জায়গায় হারাম শরীফের বিল্ডিং নির্মাণ করেছে। পূর্বে সাফা ও মারওয়াহের মাঝে বাজার ছিলো। হাজীদেরকে সে বাজারের মধ্যে দিয়ে ও রোদে সায়ী করতে হতো। বর্তমান সকল বিল্ডিং-এ এয়ার কন্ডিশন লাগানো হয়েছে ও মার্বেল পাথর বিছানো আছে।

সাফা পৌঁছে ক্বাবা শরীফের দিকে মুখ করে সায়ীর নিয়ত এইভাবে করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِوَجْهِكَ الْكَرِیْمِ، فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ আমি সাফা ও মারওয়াহের মাঝে ৭ চক্করের সায়ী করতে চাই। কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং তুমি আমার জন্য সায়ী করা সহজ করো ও তুমি কবুল করো।

নিয়ত করার সময় দোয়া করার মতো হাত তুলবেন, নামাজের তকবীরের মতো তুলবেন না।

মক্কা শরীফে ১৫টি জায়গা এমন আছে যেখানে দোওয়া অবশ্যই কবুল হয়।

১। তাওয়াফ স্থল (যেখানে তাওয়াফ করা হয়)
২। মুলতাযিম (ক্বাবাগৃহের চৌকাঠ)
৩। মীযাবে রহমতের নীচে (ক্বাবাগৃহের ছাদের উপর নালী)
৪। হাতীম (ক্বাবাগৃহ সংলগ্ন ঘেরা অংশ)
৫। ক্বাবাগৃহের ভিতরে
৬। জমজমের কুপের নীচে
৭। মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে
৮। সাফা
৯। মারওয়াহ
১০। সায়ীস্থল বিশেষ করে দুই সবুজ লাইটের মাঝে
১১। আরাফাত
১২। মুযদালফা
১৩। মীনায় ছোট ও মাঝের শয়তানের নিকট
১৪। হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝে
১৫। হাজারে আসওয়াদের নিকট

সাফা, মারওয়াহ ও সায়ীস্থল ঐ পবিত্র স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়। এইজন্য সায়ীর মাঝে ও পরে আপনি যখনই সাফা ও মারওয়াহে অবস্থান করবেন খুব বেশি দোয়া চাইবেন।

সাফা, মারওয়াহে যখনই দাঁড়াবেন তিনবার চতুর্থ কলমা ও একবার তৃতীয় কলমা পড়বেন। সায়ীর মাঝে বেশী করে চতুর্থ কলমা পড়তে থাকবেন। এটা ইবাদতের সহজ পদ্ধতি। তবে সায়ীর প্রতি চক্করের পৃথক পৃথক দোয়া আছে যেগুলি আপনি হজ্বের বই দেখেও পড়তে পারেন।

হজরত হাজেরা (রঃ) সাফা ও মারওয়াহের মাঝে যে পল্লি ছিলো দৌঁড়ে অতিক্রম করতেন। কেননা হজরত ইসমাইল যিনি কাবাগৃহের পাশে ছিলেন। দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতেন। তাঁর এই সুন্নত আজও জারী রাখা হয়েছে। সরকার দুটি সবুজ রং এর স্তম্ভ ও টিউবলাইট চিহ্ন স্বরূপ লাগিয়ে দিয়েছে। যাকে “মিলাইন আখজারাইন ” বলা হয়। যার মাঝে পুরুষদেরকে দৌঁড়ে চলতে হয় ও নারীরা স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

সাফা থেকে আরম্ভ করে মারওয়াহ পর্যন্ত যাওয়া সায়ীর এক চক্কর হয় ও পুনরায় মারওয়াহ থেকে আরম্ভ করে সাফা পর্যন্ত পৌছানো এটা সায়ীর দ্বিতীয় চক্কর হয়। এইভাবে আপনি সায়ীর ৭ চক্কর পূর্ণ করবেন ও সায়ীর ৭ম চক্কর মারওয়াহে সমাপ্ত হবে।

সায়ীর স্থান খুব সীমিত। এইজন্য হজ্বের বিশেষ দিনে এখানে প্রচণ্ড ভীড় হয়। তাওয়াফের চেয়ে বেশী সময় সায়ীতে লেগে যায়। এই অবস্থায় যদি প্রথম তলা বা ছাদে সায়ী করা হয় তাহলে খুব উত্তম হয়।

সায়ী পূর্ণ করে দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব (উত্তম) তবে জরুরী নয়। দুই রাকাত নামাজ পড়ে মারওয়াহের দিক দিয়ে বাইরে বেরোন। এবারে আপনাকে উমরার শেষ অঙ্গ পালন করতে হবে। যেটা হচ্ছে মাথার চুল ছোট করা বা ন্যাড়া হওয়া। মারওয়াহের বাইরে কয়েক ডজন সেলুনের দোকান আছে। যে কোন দোকানে গিয়ে ন্যাড়া হয়ে যান। নারীরা নিজের এক চতুর্থ অংশ চুলের এক ইঞ্চি কেটে নেবেন। ঐ সমস্ত লোক যারা উমরার সমস্ত কাজ পূর্ণ করেছেন কেবল চুলকাটা বাকি আছে তারা নিজের চুলও কাটতে পারেন ও নিজের মতো অন্য লোকেরও চুল কাটতে পারেন যাদের কেবল মাত্র চুল কাটার কাজ বাকী রয়েছে। নারীদের কেবল নিজের স্বামী বা মহরিম পুরুষ (যার সঙ্গে কোন রকমে বিবাহ হতে পারে না) দ্বারা চুল কাটানো উচিৎ। না-মুহরিম দ্বারা চুল কাটানো অনুচিৎ। এতে গোনাহ হবে।

মাথা ন্যাড়া হওয়া বা চুল কাটানোর সঙ্গেই এহরাম অবস্থায় আপনার জন্য যে কাজগুলি নিষিদ্ধ ছিল তা শেষ হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ আপনার উমরা পূর্ণ হলো। এবারে আপনি কামরায় গিয়ে স্নান করে দৈনন্দিনের কাপড় পরে নিন।
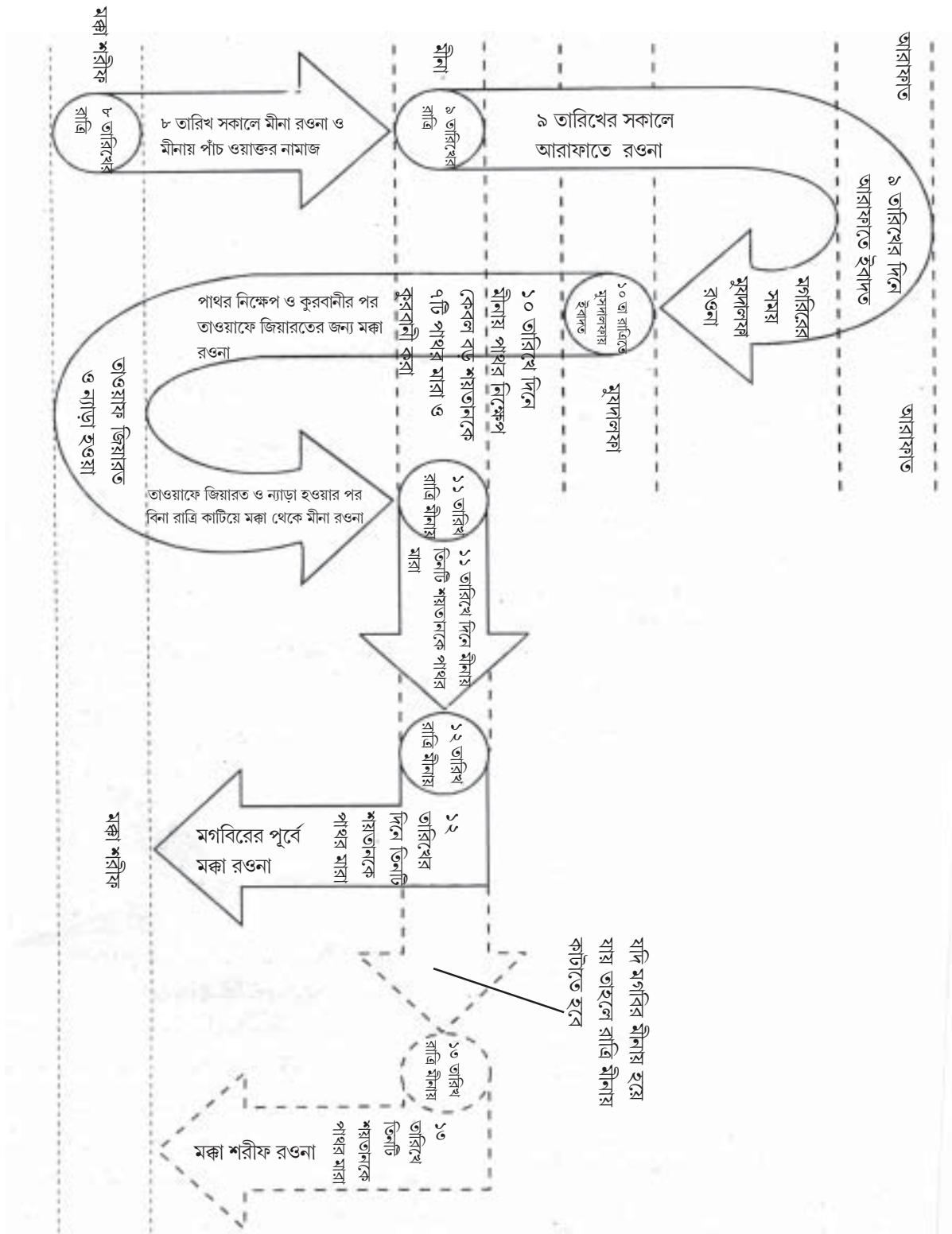
যারা মক্কা শরীফে অবস্থানকারী তাদের জন্য হারাম শরীফে নফল নামাজ পড়া উৎকৃষ্ট ইবাদত। কিন্তু যারা মক্কা শরীফের বাইরে থাকেন তাদের জন্য হারামে নফল তাওয়াফ, নফল নামাজের চেয়ে উত্তম। কেননা নফল নামাজ আপনি বাড়ি পৌঁছেই পড়তে পারেন। কিন্তু তাওয়াফের সুযোগ অন্য কোথাও পাবেন না। এইজন্য যতক্ষন মক্কা শরীফে আছেন যত বেশী সম্ভব তাওয়াফ করার চেষ্টা করবেন ও সকল নামাজ হারাম শরীফে জামাত সহ পড়তে চেষ্টা করবেন। হারাম শরীফের নিকটে অনেক মসজিদ আছে। লোক সুবিধার জন্য ওখানে বা নিজ বাসস্থানে জামাত করে নামাজ পড়ে নেয়। কিন্তু একটি নেকি এক লক্ষ নেকিতে পরিবর্ত্তন হওয়ার ফজিলত কেবল হারাম শরীফে আছে, আশেপাশের কোন মসজিদে নয়।

রমজান মাসে উমরাহ

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন রমজান মাসের উমরা হজ্ব করার সমতুল্য সওয়াব রাখে। কিম্বা এ কথা বলেছেন ঐ হজ্বের সমতুল্য যেটা আমার সঙ্গে করা হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম)

হজ্বের বিশেষ ছয় দিন

সহজ হজ্ব

৮ই জিলহিজ্জাহ হইতে ১৩ই জিলহিজ্জাহ পর্যন্ত হজ্বের বিশেষ ছয়দিন আপনাকে এইভাবে কাটাতে হবে।

৮ই জিলহিজ্জাহ

ইসলামী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যেকোন দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে রাত্রি আরম্ভ হয় ও পুনরায় দিন আসে। ৭ই জিলহিজ্জাহ সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর ৮ তারিখের রাত্রি আরম্ভ হয়ে যায়। মুয়াল্লিমের কর্মীরা বেশির ভাগ ঐ রাত্রিতে মীনায় পৌছে দেয়। মুয়াল্লিমের কাছ থেকে রওনা হওয়ার ব্যাপারে জেনে নিন ও প্রস্তুত থাকুন।

রওনার পূর্বে অপ্রয়োজনীয় চুল পরিষ্কার করে স্নান করে এহরাম পরে নেবেন। যদি সম্ভব হয় ৮ তারিখে এহরাম পরে তাওয়াফে তাহিইহ্য়া করুন। (এই তাওয়াফ ফরজ বা ওয়াজেব নয়) যদি আপনি কেবল তাওয়াফ করেন, তাহলে এজতেবা ও রমল করবেন না। কিন্তু যদি আপনার সঙ্গে বৃদ্ধ, দুর্বল বা মহিলা থাকে ১০ই জিলহিজ্জাহ লোকের ভীড়ের কারণে আপনি সায়ী পূর্বে করতে চান তাহলে অনুমতি আছে। এই অবস্থায় তাওয়াফে তাহিইহ্য়ার পর সায়ী করুন তবে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল ও ইজতেবা করতে হবে। এইভাবে তাওয়াফ ও সায়ী করলে তাওয়াফে জিয়ারতের পর আপনাকে সায়ী করতে হবে না। আর ঐ তাওয়াফে আপনাকে রমল ও ইজতেবা করতে হবে না। কিন্তু শক্তিশালী লোকের জন্য তাওয়াফে জিয়ারতের পর সায়ী করা উত্তম।

তাওয়াফে তাহিইহয়ার পর দুই রাকাত তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ মাথা ঢেকে পড়ুন ও পুনরায় মাথা খুলে হজ্বের নিয়ত এইভাবে করুন।

اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য হজ্বের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য সহজ করুন ও কবুল করুন।

নিয়ত করে তালবিয়া পড়ুন।

لبيك اللهم لبيك

অর্থ ঃ— উপস্থিত হয়েছি। আমার প্রভু আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি।

لبيك لا شريك لك لبيك

আমি উপস্থিত হয়েছি, আপনার কোন অংশীদার নেই আমি উপস্থিত হয়েছি।

إن الحمد والنعمة لك والملك

সর্বরকম গুনগান ও প্রশংসার আপনিই যোগ্য। সকল নিয়ামত আপনার। সারা বিশ্বে আপনারই আদেশ চলে।

لا شريك لك আপনার কেহ অংশীদার নেই।

তালবিয়া একবার পড়া ফরজ ও তিনবার পড়া সুন্নত। তালবিয়া পড়ার সাথে সাথে আপনি মুহরিম হয়ে গেছেন ও এহরামে সকল নিষেধাজ্ঞা আপনার উপর জারী হয়ে গেছে।

সংক্ষিপ্ত সামগ্রী নিয়ে বাসে চড়ার দোয়া পড়ে বাসে বসে যান। বাস আপনাকে মীনার তাবুতে পৌঁছে দেবে।

মীনায় আপনাকে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হবে। জোহর, আসর, মগরিব, ইশা ও দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাজ।

৯ই জিলহিজ্জাহ

৯ই জিলহিজ্জাহ ফজরের নামাজ হইতে তকবীরে তশরীফপড়া আরম্ভ হয়ে যাবে। ও নামাজের পর আপনাকে আরাফাতের জন্য রওনা হতে হবে।

তকবীরে তশরীফ এই

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

অর্থ ঃ— আল্লাহ সর্বব উচ্চ আল্লাহ সর্বব উচ্চ, আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই ও আল্লাহ সর্বব উচ্চ আল্লাহ সর্বব উচ্চ সর্ববরকম প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য।

আরাফাতে খাবার ব্যবস্থা বেশিরভাগ মুআল্লিমের পক্ষ থেকে থাকে। এইজন্য আরাফাত পৌঁছে সবচিন্তা দূর করে একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যান।

আরাফাতে আপনাকে কেবল দুই ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হবে। জোহর ও আসর যদি আপনি মসজিদ নামরার নিকটে থাকেন তাহলে ইমামের পিছনে দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রিত ক্বসর করে পড়ুন। আর যদি মসজিদ হইতে দূরে থাকেন তাহলে নিজস্থানে জামাত করে জোহরের সময় জোহর ও আসরের সময় আসর পড়ুন।

৯ই জিলহিজ্জার দিন এমনিই উত্তম দিন। তবে আসর ও মগরিবের সময় আরো উত্তম। এই সময় আপনি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চান এটা অমূল্য সময় কেঁদে কেঁদে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন আরফার দিনে আল্লাহতায়ালা সবচেয়ে বেশি নিজ বান্দাকে জাহান্নামের আগুন হইতে পরিত্রান দেন। (মুসলিম)

পুনরায় কিয়ামতের দিন এই স্থানই হবে। সূর্য মাথার নিকটে হবে। আল্লাহপাক রাগান্বিত অবস্থায় হবেন আর আপনি নিজ কর্মের হিসাব দেবেন। সম্ভবতঃ সে দিন আপনার কোন ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে রাখার অবকাশ না পান।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মগরিবের নামাজ না পড়ে আপনাকে মুযদালফার দিকে রওনা হতে হবে। মুযদালফা পৌঁছে মগরিব ও ইশার নামাজ একত্রিত জামাতে পড়তে হবে। দুই নামাজ পৃথক তকবীরে পড়তে হবে কিন্তু আজান একবার পড়তে হবে।

নামাজ পড়ে সম্ভব হলে সারারাত্রি ইবাদতে থাকুন।

আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন, যখন তোমরা আরফাত হইতে ফিরবে মাসআরুল হারামে (মুযদালফা) আল্লাহকে স্মরণ করো আর এইভাবে স্মরণ করো যেভাবে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে। এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোক এই পদ্ধতি অবগত ছিলো না। (সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৯৮)

হাজ্বীদের জন্য এই রাত্রিটি যারা মুযদালফায় উপস্থিত হয়েছেন শবে কদরের চেয়েও উত্তম রাত্রি। এই জন্য এই রাত্রির গুরুত্ব বুঝুন ও যতবেশী সম্ভব ইবাদতের চেষ্টা করুন।

সকালে আজান ও তকবীর সহ জামাতে নামাজ পড়ুন। সূর্য্য উদয় হওয়ার ৫-১০ মিনিট পূর্বে মীনার জন্য রওনা হয়ে যান।

মীনা, আরাফাত ও মুযদালফায় আপনি আপনার তাঁবুর সাথীদের সঙ্গে আজান দিয়ে নামাজ পড়বেন। সরকার ও মুআল্লিমের পক্ষ থেকে তার কোন ব্যবস্থা থাকেনা।

মুযদালফা থেকে ৪৯-৭০টি পাথর রমিয়ে জেমারের (শয়তানকে পাথর মারার) জন্য কুড়িয়ে নিন। এই পাথরগুলি মুযদালফা হইতে কুড়ানো জরুরী নয়। অন্য স্থান হইতেও কুড়াতে পারেন। তবে মুযদালফা হইতে কুড়ানো পাথর ধোয়া জরুরী নয় তবে যদি না-পাকের সন্দেহ হয় তাহলে ধুয়ে নেবেন।

মুযদালফায় রাত্রিতে অবস্থান করার জন্য কোন তাঁবু ইত্যাদি থাকেনা। রাত্রিতে খোলা আকাশের নিচে চাটাই বিছিয়ে কাটাতে হবে। মুযদালফায় স্থানে স্থানে Toilet এর ব্যবস্থা আছে। তবুও আপনি যেখানে অবস্থান করবেন প্রস্রাব-পায়খানার ব্যবস্থা সেখান থেকে দুরে হওয়া সম্ভব। এই জন্য আরাফাতে দিনে আপনার খাওয়া-দাওয়া সীমিত রাখবেন ও পানি কিছু বেশী সঙ্গে রাখবেন।

১০ই জিলহিজ্জাহ

মুযদালফা হইতে মীনায় আপনার তাঁবুতে ফিরে আসুন। মুযদালফা হইতে মীনা ১ কিলোমিটার দুরত্বে। কিন্তু বেশীরভাগ লোক রাস্তা ভুলে কয়েক ঘণ্টা তাঁবু সন্ধান করতে লাগিয়ে দেয়। এই জন্য মক্কা হইতে মীনা রওনা হওয়ার পূর্বে মুআল্লিমের কাছ থেকে মীনার একটা চিত্র নেবেন ও মীনার নিজ তাঁবুর নিকটতম খাম্বার উপর যে নাম্বার উল্লেখ থাকবে সেটা লিখে রাখবেন। এতে আপনার তাঁবু সন্ধান করতে সহজ হবে।

আজ আপনাকে নিম্নলিখিত ৪টি কাজ করতে হবে।

(১) শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা (রমিয়ে জেমার) (২) কুরবানী করা (৩) মাথা মুণ্ডন করানো (হালাক্ব করা) (৪) তাওয়াফে জিয়ারত করা।

রমিয়ে জেমারের উত্তম সময় সূর্য্য উদয় থেকে জোহর পর্যন্ত। কিন্তু এই সময় খুব ভীড় হয় ও প্রাণের ভয় থাকে। এই জন্য সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত পাথর মারা জায়েজ বলেছেন। এই জন্য নিজেকে বিপদের মুখে না ফেলে জোহরের পরই পাথর মারতে যাবেন। আজ কেবল বড় শয়তানকে পাথর মারতে হয়।

বড় শয়তানকে পাথর মারার সময় আপনি এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে মক্কা বামদিকে ও মীনা ডানদিকে হয়। দ্বিতীয় দুই শয়তানের জন্য এ রকম আদেশ নেই।

আপনাকে ৭টি পাথর মারতে হবে। প্রতি পাথর পৃথক পৃথক মারবেন ও পাথর মারার সময় এই দোয়া পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِلرَّحْمٰنِ

অর্থ ঃ— আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্ববউচ্চ। এই পাথর শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্য ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মারছি।

রমির প্রথম পাথর মারার সঙ্গে সঙ্গে আপনার তালবিয়া পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। পাথর মারার জন্য পুলের (ব্রীজের) উপর থেকে মারুন কেননা পুলের উপর চওড়া জায়গা থাকে ও অস্বস্তিবোধ হবেনা। যখন শয়তানের নিকটে পৌঁছাবেন ডান বামদিক করে একটু আগে বেড়ে যান ও ফিরে অন্য দিক থেকে পাথর মারবেন কেননা যত যোশভরা মানুষ শয়তানের নিকটে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পাথর মারতে আরম্ভ করে দেন। ফলে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়ে যায়।

কুরবানী

প্রতি হাজ্বীকে নিজের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করতে হয়। কুরবানী হারামের সীমায় করতে হবে। ১২ তারিখে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত করতে পারবেন। তবে ১০ তারিখে করা উত্তম। হজ্বের মাঝে কিছু ভুলের জন্য দম (কুরবানী) দেওয়া জরুরী হয়ে থাকে। যদি আপনার উপর জরুরী হয়ে থাকে তাহলে কুরবানীর সঙ্গে করে দিন।

ছাগল বা দুম্বার কুরবানী ১টি কুরবানীর সমতুল্য। গাই বা উটে ৭টি অংশ হতে পারে। এইজন্য নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা জবেহস্থানে গিয়ে কুরবানী করে দিন।

হলক্ব (মুণ্ডন)

কুরবানীর পর মাথার চুল ছোট করানো বা মুণ্ডন করাতে হয়। তবে মুণ্ডন করানো উত্তম। মাথা মুণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে এহরামের সকল নিষেধাজ্ঞা আপনার উপর থেকে দুর হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী তাওয়াফে জিয়ারতের পরই বৈধ হবে। এভাবে আপনি স্নান করে এহরাম খুলে সাধারন পোষাক পরিধান করতে পারেন।

তাওয়াফে জিয়ারত

এহরাম খোলার পর আপনাকে ক্বাবা শরীফে তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী করতে হবে। তাওয়াফে জিয়ারতে উত্তম দিন ১০ই জিলহিজ্জাহ। যদি ১২ তারিখে সুর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে করে নেওয়া হয় তাও জায়েজ আছে। যদি ১২ তারিখ অতিক্রম করে যায় ও তাওয়াফে জিয়ারত না করেন তাহলে দেরীর কারনে দম ওয়াজেব হবে আর তাওয়াফের ফরজও বাকী থাকবে।

এই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমলও করতে হবে। তবে এহরামের চাদর শরীরে না থাকার জন্য ইজতেবা করতে হবে না।

যদি আপনি ৮ জিলহিজ্জার এহরাম পরার পর নফল তাওয়াব করে থাকেন যাতে রমল ও ইজতেমা ও সায়ী করে থাকেন তাহলে তাওয়াফে জিয়ারতে দ্বিতীয়বার সায়ীর প্রয়োজন নেই। আপনার তাওয়াফও বিনা রমলে হবে। কেননা যে তাওয়াফের পর সায়ী করা হয় সেই তাওয়াফে রমল করতে হয়।

শয়তানকে পাথর মারা, কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডন করা ও তাওয়াফে জিয়ারত এগুলি ধারাবাহিক করা সুন্নত ও জরুরী। যদি এই কাজগুলি আগে পিছে হয়ে থাকে তাহলে হানাফী মতে দম দিতে হবে।

হাম্বলী মতে (সৌদি উলামা) ও ইমাম গাজ্জালীর মতে বিশেষ কারনে যদি আগে পিছে হয়ে থাকে দম জরুরী হবেনা (এহইয়াউল উলুম 'উর্দু প্রথম খণ্ড' (পৃষ্ঠা-৪০৮)

হজরত ইমাম গাজ্জালীর মতে তাওয়াফে জিয়ারতের সময় ১০ম তারিখের অর্ধেক রাত্রির পর আরম্ভ হয় আর ওর উত্তম সময় ১০ তারিখ ও শেষের কোন সীমা নেই। যতক্ষন চায় দেরী করতে পারে কিন্তু যতক্ষন এই তাওয়াফ না করবেন এহরামের কিছু নিষেধাজ্ঞা তার উপর বাকী থাকবে অর্থাৎ স্ত্রী-বৈধ হবে না।

(এহইয়াউল উলুম 'উর্দু প্রথম খণ্ড' (পৃষ্ঠা-৪০৮)

হাম্বলী মতে যদি কোন কারনে ১২ তারিখে সুর্য্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত যেটা উত্তম সময় সায়ী না করতে পারে তাহলে জিলহিজ্জাহ মাসের শেষ পর্যন্ত করতে পারে।

১১ ও ১২ জিলহিজ্জাহ

তাওয়াফে জিয়ারতে আপনার যতটাই সময় লাগে না কেন রাত্রি কাটানোর জন্য আপনাকে মীনায় ফিরে যেতে হবে। মক্কা শরীফে নিজের বাসস্থানে রাত্রিতে থাকার অনুমতি নেই।

১১ ও ১২ তারিখে মীনায় অবস্থান করে আপনাকে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ জামাত সহ পড়তে হবে ও বেশীরভাগ সময় তসবীহ তিলাওয়াত ও জেকেরের মাধ্যমে কাটাতে হবে আর তিনটি শয়তানকে পাথর মারতে হবে। ছোট ও মাঝের শয়তানকে পাথর মেরে কেবলার দিকে দোয়া করুন। এটা ঐ স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়। বড় শয়তানকে পাথর মেরে দোয়া করবেন না।

১০, ১১ ও ১২ তারিখের রাত্রি মীনায় কাটানো ওয়াজেব। ১২ তারিখে শয়তানকে পাথর মেরে আপনি মক্কা রওনা হতে পারেন। যদি ১৩ তারিখে মীনায় অবস্থান করে তিনটি শয়তানকে পাথর মারেন তাহলে এটা সওয়াবের কাজ। তবে যদি না অবস্থান করেন কোন গোনাহ নেই। যদি কেবল ১২ তারিখ পর্যন্ত পাথর মারা হয় তাহলে ৪৯টি পাথরের প্রয়োজন। কিন্তু যদি ১৩ তারিখে অবস্থান করতে হয় তাহলে অতিরিক্ত ২১টি পাথরের প্রয়োজন হয়। এইজন্য মুযদালফা হইতে ৭০ বা কিছু বেশী পাথর সংগ্রহ করবেন।

এইভাবে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আপনার হজ্বের পূর্ণকর্ম সম্পন্ন হলো। মক্কা শরীফে আপনার একটি জরুরী ও ওয়াজেব কর্ম আছে তাহল তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ)।

বিদায়ী তাওয়াফ

হজ্বের পর যখন আপনি স্বদেশ বা মদিনা শরীফ রওনা হবেন, রওনার তাওয়াফ বা বিদায়ী তাওয়াফ করা হয়। এটা প্রত্যেক বাইরে থেকে আগমনকারীর (আফাকী) উপর ওয়াজেব।

মক্কাবাসী বা মীকাতের সীমার মধ্যে অবস্থানকারীর জন্য ও কেবল উমরার নিয়তে আগমনকারীর জন্য ইহা ওয়াজেব নয়।

তাওয়াফে বিদায়ী ঐ ভাবেই করা হয় যেমন উমরাহ বা হজ্বে তাওয়াফ করা হয়। তবে এই তাওয়াফের পর সায়ী করতে হবে না আর এতে রমলও নেই।

বিদায়ী তাওয়াফের পর আল্লাহর কাছে এই পবিত্র ঘরের বারবার দর্শন করার তৌফিকের জন্য দোয়া করুন। নিজের জন্য, আত্মীয়দের জন্য ও মুসলিম জগতের জন্য ইহকাল ও পরকালের শান্তির জন্য দোয়া করুন ও অশ্রুর উপঢৌকন উপস্থিত করে দেশে ফেরার জন্য রওনা হয়ে যান।

বিদায়ী তাওয়াফের পর যদি কোন কারনে মক্কা শরীফে অবস্থান করতে হয় তাহলে আপনি আরো তাওয়াফ যদি করতে চান করতে পারেন ও নামাজও পড়তে পারেন।
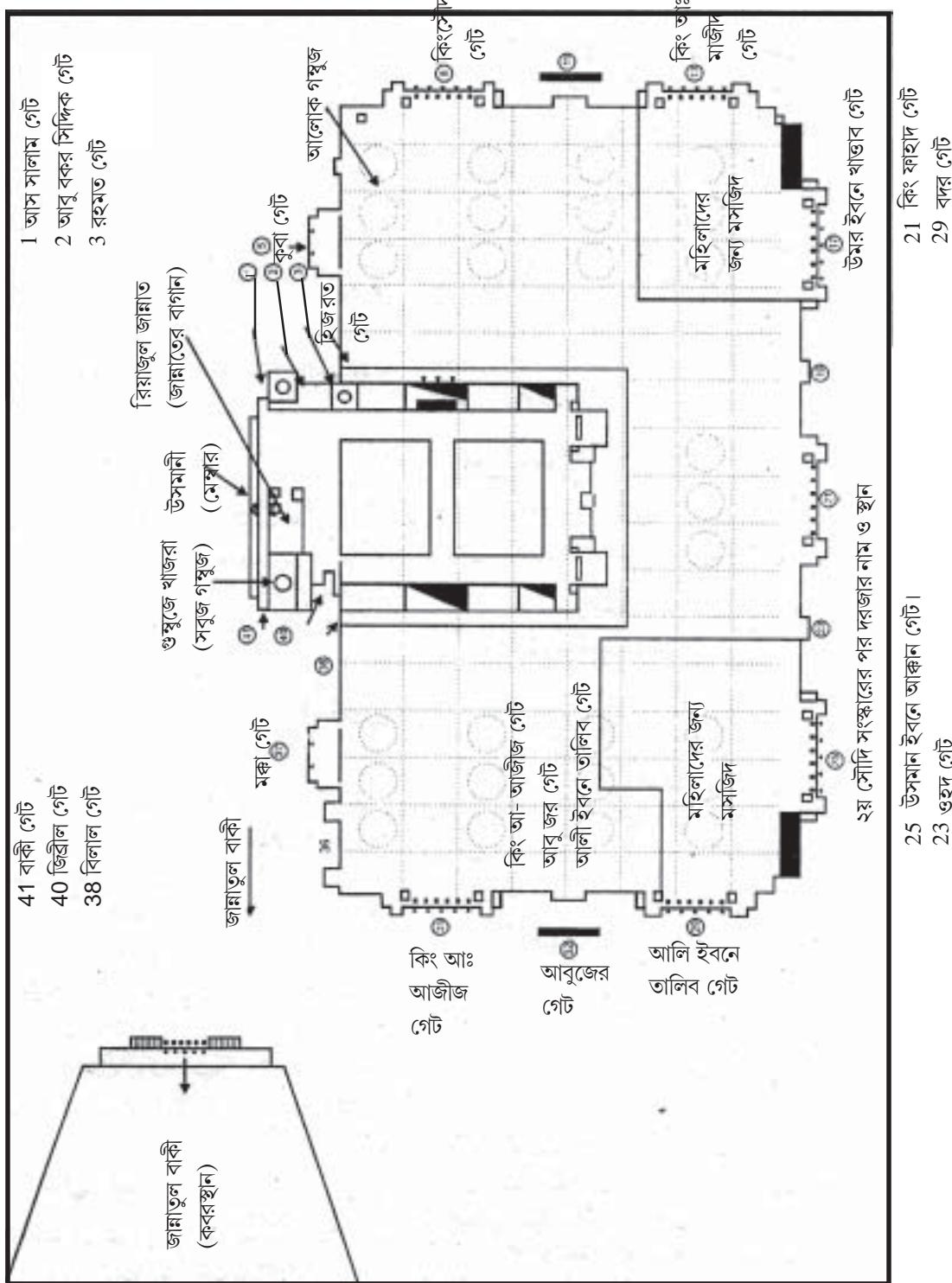
দুর্বলের পক্ষ থেকে হজ্ব

হজরত ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করেন হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার উপর হজ্ব ফরজ করেছেন আমার পিতার উপর এমন সময় ফরজ হয় যখন তিনি একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। বাহনের উপর বসতেও পারবেন না। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন হাঁ, (বোখারী, মুসলিম)।

হজরত লাকীত বিন আমির (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হন ও জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসুল আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, না হজ্ব করতে পারবেন আর না উমরাহ। চলার বা বাহনে চড়ার শক্তি নেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও উমরাহ করে নাও।

মসজিদে নববীর চিত্র

রসুলের দরবারে উপস্থিত হওয়ার ফজিলত

(১) নিশ্চয় তোমাদের কাছে আমার পয়গম্বর এসেছেন। যিনি তোমাদের একজন ছিলেন। তিনি ঐ সকল কর্মে কষ্ট পায়, অসন্তুষ্ট হন যাতে তোমাদের ক্ষতি হয় ও কষ্ট পাও। তিনি তোমাদের কৃতকার্য্য চান। ইমান ওয়ালাদের উপর বড় দয়ালু। (কুরআন শরীফ)

(২) কোন মানুষ ঐ সময় পর্যন্ত মোমিন হতে পারেনা যতক্ষন হুজুর (দঃ) দুনিয়া ও দুনিয়ার প্রতি বস্তুর চেয়ে বেশী প্রিয় না হবে। (হাদিস শরীফ)

(৩) একজন মোমিনের উপর তার প্রাণের চেয়ে বেশী হক হুজুর (দঃ)-এর। (হাদিস শরীফ)

(৪) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন যে ব্যক্তি আমার মসজিদে (মসজিদে নবভী) ৪০ ওয়াক্তের নামাজ পড়ে ও কোন নামাজ কাজা না করে নেফাক ও জাহান্নামের আগুন হতে নিষ্কৃতি পাবে।

(৫) একটি হাদিসের সারমর্ম যদি আল্লাহ পাক হুজুর (দঃ) -কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা না করতেন তাহলে তিনি না এই জগৎ সৃষ্টি করতেন আর না নিজের প্রতিপালক হওয়া প্রকাশ করতেন।

(৬) এবং তিনি তার নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করবে ও তোমার কাছে উপস্থিত হবে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে ও হুজুর (দঃ) তাদের সুপারিশ করবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহকে কবুলকারী ও মেহেরবান পাবে। (সুরা নিশা আয়াত-৬৪)

(৭) হাদিসের সকল কিতাবে মসজিদে নবভীর নামাজের অন্যান্য মসজিদের চেয়ে ৫০ হাজারগুন বেশী। ফজিলতের হাদিসের উল্লেখ আছে।

(৮) হাদিসের সকল কিতাবে তিনটি মসজিদ ব্যতিত সওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোন মসজিদের জন্য সফর করা নিষেধ। (১) মসজিদে হারাম (২) মসজিদে আকসা (৩) মসজিদে নবভী

উল্লেখিত আলোচনায় আপনি হুজুর (দঃ) এর মহত্ব, তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসা ও আপনার উপর তাঁর হকের অনুমান করতে পারেন। এই জন্য আল্লাহতায়ালার পবিত্র ঘর ক্বাবা শরীফের দর্শনও হজ্বের পর জীবনের চেষ্টা দ্বিতীয় ও সবচেয়ে বড় উচ্চমর্যাদার সৌভাগ্য আল্লাহপাক আপনাকে তৌফিক দিয়েছেন তাহলো মসজিদে নবভী ও জগতের শান্তির উৎস বিশ্বনবীর রওজা মোবারক দর্শন করা। হুজুর (দঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মদিনা শরীফ পৌঁছানোর শক্তি রাখে ও হজ্ব করে আমার যিয়ারত না করে ফিরে সে আমার সঙ্গে বড় বে-ইনসাফী করলো।

হুজুর (দঃ) আরো বলেছেন যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার জিয়ারত করলো সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় জিয়ারত করলো।

এইজন্য এটা আপনার বড় সৌভাগ্য ৪০ ওয়াক্তের নামাজ পড়ে আপনি নেফাক ও জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ পাচ্ছেন ও কিয়ামতে হুজুর (দঃ) এর সুপারিশের হকদারও হচ্ছেন।

এইজন্য মদিনায় অবস্থান করা অমুল্য সম্পদ মনে করে কোন নামাজ কাজা না করে ৪০ ওয়াক্তের নামাজ অবশ্যই পড়ুন ও খুব আদব ও এহতেরামের সাথে হুজুর (দঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রতিদিন পেশ করবেন।

রসুলের দরবারে প্রথম উপস্থিতি

(১) ভালোভাবে স্নান করে নুতন কাপড় পরিধান করুন। খুশবু লাগিয়ে নিন ও দরুদ ও সালাম পড়তে পড়তে মসজিদে নবভীর দিকে আগে বাড়ুন।

(২) মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ—আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি ও রসুলুল্লাহ (দঃ) এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠাচ্ছি।

ডান পা মসজিদে হারামে রেখে এই দোয়া পড়ুন।

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

অর্থ ঃ— হে আমার প্রতিপালক আমার গোনাহ ক্ষমা করো ও আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দাও।

(৩) যদি জামাতের সময় না হয় তাহলে দুই রাকাত তাহইয়াতুল মসজিদ পড়ে নিন। আর যদি জামাতের সময় হয়ে থাকে প্রথমে জামাতে নামাজ পড়ে নিন।

(৪) পবিত্র রওজা (সমাধি) মসজিদে কেবলার দিকে (দক্ষিণ দিক) আছে। পবিত্র রওজার জিয়ারতের জন্য আপনাকে পশ্চিম দিক থেকে দরজা নং-১ বাবে সালাম হইতে প্রবেশ করতে হবে।

(৫) খুব নম্রতার সঙ্গে দরুদ ও সালাম ধীরে ধীরে পড়তে পড়তে আগে বাড়ুন। ইহা আদবের স্থান। আওয়াজ নিম্নে রাখুন। অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকুন ও পূর্ণ

খেয়াল ইহকালের ও পরকালের বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার উপর রাখুন।

(৬) পবিত্র রওজার সামনে তিনটি জালি আছে। কিন্তু হুজুর (দঃ), হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হজরত উমর ফারুক (রাঃ) তিন মহোদয় মাঝের জালির পিছনে আরাম করছেন।

নিজ রওজা মুবারকে হুজুর (দঃ)-এর কদম মুবারক পূর্ব দিকে মাথা পশ্চিম দিকে ও নুরাণী মুখমণ্ডল মুবারক কেবলা দিকে (দক্ষিণ) আছে। যখন আপনি পবিত্র সমাধির সামনে দাঁড়াবেন আপনার পিঠ কেবলার দিকে হবে ও আপনার মুখ হুজুর (দঃ)-এর নুরাণী মুখমণ্ডলের দিকে হবে।

হুজুর (দঃ)-এর পিছনে (উত্তর দিকে) কাঁধের সোজা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আরাম করছেন ও হজরত আবু বকর সিদ্দিকির (রাঃ) পিছনে হজরত উমর ফারুক (রাঃ) আরাম করছেন।

(৭) মাঝের জালিতে তিনটি ফুটো আছে। প্রথম ফুটোর সামনে হুজুর (দঃ)এর নুরাণী মুখমণ্ডল আছে। এখানে পৌঁছে আপনি থেমে যান ও এইভাবে সালাম পড়ুন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ
اَلصَّلٰوةُوَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ.

(৮) হুজুর (দঃ)-এর উপর দরুদ ও সালাম পড়ার পর এক ফুট ডানদিকে বেড়ে দ্বিতীয় ফুটোর সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন। এই ফুটোর সামনে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর পবিত্র মুখ আছে। এখানে এইভাবে সালাম পড়বেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
فِى الْغَارِ وَرَحْمَةُاللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আপনার উপর সালাম হউক।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর খলিফা আপনার উপর সালাম হউক।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর ওজির আপনার উপর সালাম হউক।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর গর্তের সাথী আপনার উপর সালাম হউক ও আল্লার রহমত অবতীর্ণ হউক।

(৯) হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) উপরে সালাম পড়ার পর একফুট ডানদিকে আগে বেড়ে যান ও তৃতীয় ফুটোর সামনে দাঁড়িয়ে যান। এই ফুটোর সামনে হজরত উমর ফারুক (রাঃ) পবিত্র মুখ আছে। হজরত উমর ফারুকের (রাঃ) এইভাবে সালাম পড়ুন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّالْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَاالْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَاءِ
وَالْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

হে উমর ইবনে খত্তাব (রাঃ) আপনার উপর সালাম হউক।

হে মুসলিম সর্দার আপনার উপর সালাম হউক।

হে মুসলমান ও ইসলামের মর্যাদাদানকারী আপনার উপর সালাম হউক।

হে গরীব, দুর্বল, বৃদ্ধ, বিধবা ও এতিমদের সাহায্যকারী আপনার উপর সালাম হউক ও আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হউক।
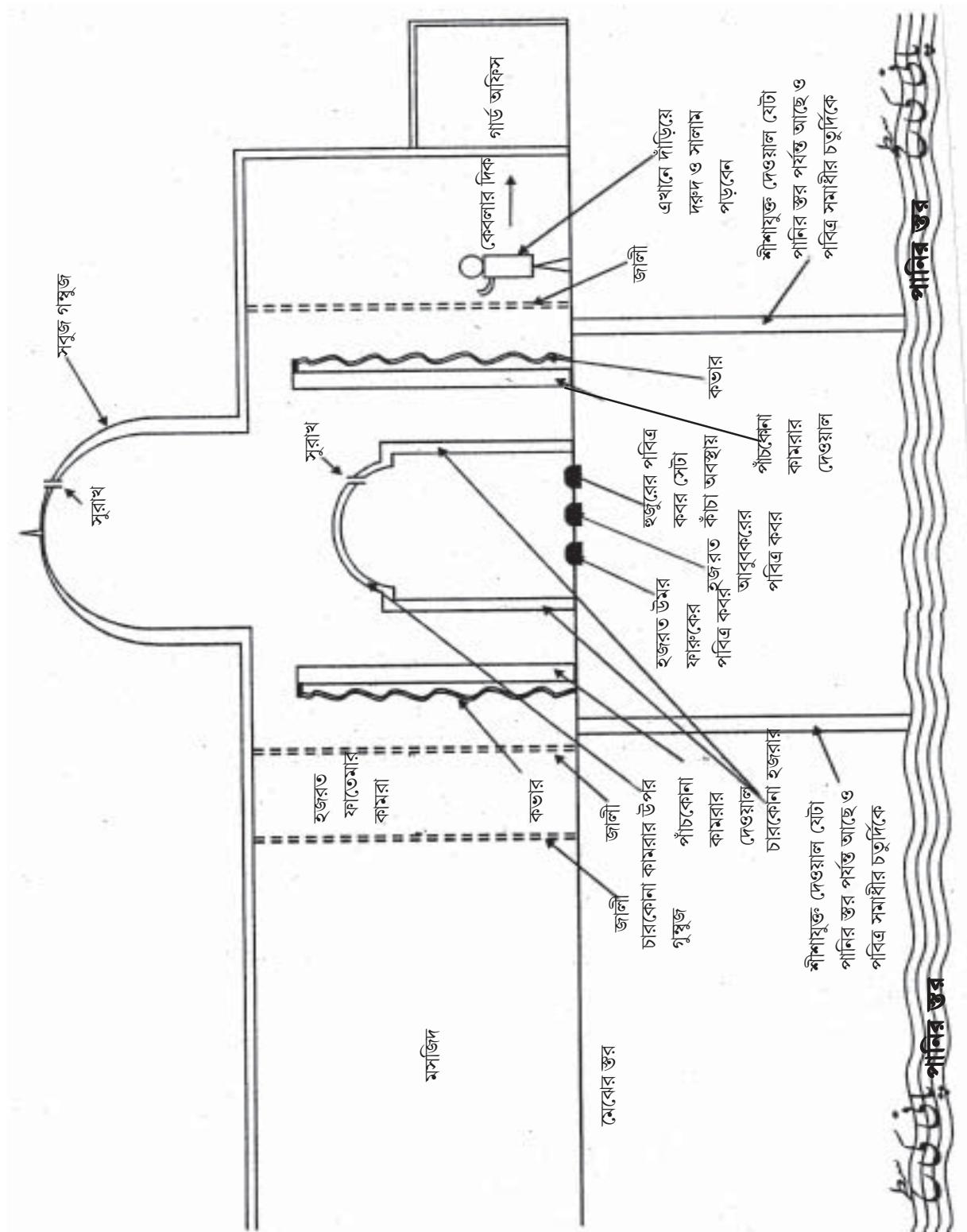
(১০) হুজুর (দঃ) বলেছেন, যখন কেহ আমার উপর দরুদ ও সালাম পড়ে আল্লাহ পাক আমার রুহকে আমার শরীরে ফিরিয়ে দেন ও আমি তার সালামের উত্তর দিই।

হুজুর (দঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক একজন ফেরেস্তা আমার কবরে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। দুনিয়ায় কেহ যখন দরুদ ও সালাম পড়ে ঐ ফেরেস্তা আমায় সালাম পৌঁছাতে থাকেন।

এইজন্য আপনি যেখান থেকেই হুজুর (দঃ)-র উপর সালাম পড়ুন না কেন হুজুর (দঃ)-কে পৌঁছানো হয়। আর তিনি উত্তর দেন। এইজন্য পবিত্র রওজার সামনে সিকিউরিটি গার্ড ও লোকের ভীড়কে সরিয়ে জালী ছোঁয়া, চুম্বন দেওয়া, রুকুর মতো ঝোঁকা বা অন্য কোন রকমের বেআদবী থেকে বাঁচুন। আল্লাহতায়ালা বলেন তোমাদের আওয়াজ রসুলুল্লাহ (দঃ)এর আওয়াজের চেয়ে বেশী ধীরে রাখো। এমন না হয় তোমাদের সকল আমল নষ্ট করে দেওয়া হয় ও তোমাদের অনুভবও না হয়।

হজরত ইমাম বোখারী ও হাজার হাজার আল্লাহওয়ালা মদিনা শরীফের পবিত্র ভূমিতে আদবের জন্য কোন দিন জুতাও পরেননি আর কোন বাহনের উপরও বসেন নি। আমিও আপনারা এতটা আদব তো করতে পারবো না তবে যত বেশী সম্ভব আদব ও এহতেরামের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

নবীজীর সমাধীর বাইরে রেখাচিত্র

পবিত্র সমাধির বিস্তারিত বর্ণনা

১। হিজরী সালের ৮৭ বৎসর পর্যন্ত মসজিদে নবভীর পূর্বদিকে পবিত্র স্ত্রীদের বাড়ী ছিলো। হুজুর (দঃ)-এর পবিত্র কবর মসজিদের বাইরে হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) কামরায় ছিল।

হজরত উমর ইবনে আঃ আজীজ হিজরী ৮৭ সালে সকল কামরা ক্রয় করে মসজিদের মধ্যে গন্য করার সিদ্ধান্ত নেন। কেননা ঐ সময় পর্যন্ত মুসলিম জননী পবিত্র স্ত্রীদের ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল ও মসজিদে স্থান কম পড়ছিলো।

মসজিদ বিস্তার করার সময় হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) কামরা ব্যতীত সকল স্ত্রীদের কামরা মসজিদের মধ্যে গন্য করা হয়েছে। ঐ সময় হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) কামরার দেওয়াল কাঁচা ও ছাদ কাঠের ছিলো। হজরত উমর ইবনে আঃ আজিজ কামরার পাশে বিনা জানালা, দরজায় উঁচু মজবুত দেওয়াল তৈরী করে ছিলেন। কামরা চারকোনা ছিলো কিন্তু বাইরের দেওয়াল পাঁচ কোনের ছিলো। এই জন্য যে এর সমতুল্য ক্বাবা শরীফের সঙ্গে না হয়। আগামী ৬০০ বৎসর পর্যন্ত মসজিদের ছাদ ও কামরার ছাদ একই ছিলো। কোন গম্বুজ ছিলনা কেবল চিহ্ন স্বরূপ পবিত্র সমাধির উপর মসজিদে ছাদ সামান্য উঁচু করা হয়েছিলো। যাতে ভুলবশতঃ কেউ পবিত্র সমাধির ছাদে না চলে যায়।

(২) হিজরী ৮৭৮ সালে বাদশা কাতিবাইয়ের যুগে দেওয়াল দুর্বল হওয়ার জন্য পুনরায় তৈরী করা হয়। যেহেতু ইসাই (খ্রীষ্টান) ও ইয়াহুদী বিভিন্ন রকম চক্রান্ত করতো এই জন্য বাদশাহ কামরার দেওয়ালও মজবুত পাথরের তৈরী করেছিলেন। সমতল (Flat) ছাদ যেহেতু দুর্বল হয় ও বারবার মেরামত করতে হয় মেরামতের সময় মজদুরদিগকে রওজা মুবারকের ছাদের উপরও কাজ করতে হয় যেটা আদবের খেলাফ। এইজন্য বাদশাহ ছাদকে মজবুত গম্বুজের আকারে তৈরী করার আদেশ দেন। এর দেওয়ালে ও গম্বুজে কোন জানালা ও দরজা ছিল না কেবল উপরের অংশে একটি ছোট সুরঙ্গ আছে। যাতে রওজা মুবারক সহজে দেখা যায়।

হিজরী ৮৭৮ সালে নুতনভাবে দেওয়াল তৈরীর সময় আল্লামা সমহুদীর হুজুর (দঃ)-এর রওজা মুবারক দর্শন করার সৌভাগ্য হয়। তিনি লিখেছেন, তিনটি কবর কাঁচা অবস্থায় আছে ভুমির সমতুল্য বা সামান্য উঁচু অবস্থায়। কবরের পাশে কোন পাথর বা ইট ইত্যাদি কিছুনেই। দেওয়াল ও গম্বুজ তৈরীর পর পুনরায় কারো এ সৌভাগ্য হয়নি, কেননা এ নির্মাণ আজও ঐ অবস্থায় আছে।

(৩) রওজা শরীফের উপরে মসজিদের ছাদ প্রথমবার শাহ মনসুর (কালাদুন) সালেহী সপ্তম শতাব্দীর শেষে গম্বুজ নির্মাণ করেন। এটা কাঠের ছিলো ও উপরে সীসার (Lead) শীট চড়ানো ছিল। সীসা শ্লেট রং-এর হয় এইজন্য গম্বুজের রং শ্লেটি ছিল।

হিজরী ৮৮৭ সালে মসজিদে আগুন লেগে গিয়েছিল। যারজন্য ঐ গম্বুজের ক্ষতি হয়। এইজন্য বাদশাহ কাতিবাই একে দ্বিতীয়বার মজবুত ইঁট ও পাথর দিয়ে নির্মাণ করেন। আগামী ৩০০ বৎসর পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে ঐ সময় গম্বুজ সাদা অথবা শ্লেট রং করা হতো।

১২৩৪ হিজরীতে বাদশাহ মাহমুদ উসমানী ওকে পুনরায় নির্মাণ করেন ও সবুজ রং করেন অর্থাৎ সবুজ গম্বুজের নির্মাণ আনুমানিক ২০০ বৎসর হয়ে হয়েছে। এই গম্বুজে একটি ছোট সুরঙ্গ আছে। যাহা নীচে নির্মিত কামরার গম্বুজের ঠিক উপরে আছে। এই সুরঙ্গ টি কেবলার দিকে আছে। যখন সূর্য্য মাথার উপরে হয় সুর্য্যের আলো পবিত্র সমাধির উপর পড়ে ও বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিও পবিত্র সমাধিতে পড়ে।

(৪) ৬৬৮ হিজরীতে প্রথমবার বাদশা রুকনুদ্দীন রেবর্স্ কামরার চতুর্পাশে পাঁচ কোন বিশিষ্ট কামরার পাশে কাঠের জালী লাগিয়ে ছিলেন যাহা ১০-১২ ফুট উঁচু ছিল। ৬৯৪ হিজরীতে শাহ জয়নুদ্দীন কাতিবাই ঐ জালীর উচ্চতা বাড়িয়ে মসজিদের ছাদ পর্যন্ত করে দেন। ৮৮৬ হিজরীতে বাদশাহ কাতিবাই এই জালিকে লৌহ ও পিতল দিয়ে পরিবর্তন করেন। কেবলার দিকে জালি বর্ত্তমানে পিতলের ও অন্যদিকের জালি লৌহের যার উপরে সবুজ রং চড়ানো হয়েছে।

এই জালির চারটি দরজা আছে। একটি কেবলার দিকে, বাবুল তৌবা। দ্বিতীয় পশ্চিম দিকে, বাবুল ওয়াফুদ। তৃতীয় পূর্বদিকে, বাবুল ফাতেমা ও চতুর্থ উত্তর দিকে, বাবুল তাহাজ্জুদ। এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে পাঁচকোনওয়ালা কামরার বাইরে পর্যন্ত আপনি পৌঁছাতে পারেন। রওজা মুবারককে দেখা বা ওখানে পৌঁছানো কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

(৫) ৫৫৭ হিজরীতে দুইজন ইসায়ী (খ্রীষ্টান) রওজা মোবারক পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল। নুরুদ্দীন জঙ্গী তাদেরকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন ও রওজা মুবারকের চতুস্পার্শে পানির স্তর পর্যন্ত মজবুত সীসা ও পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করেন। যা আজও বিদ্যমান।

(৬) হুজুর (দঃ)-এর রওজা মুবারক ও মসজিদের চিত্র যদি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয় তাহলে এইভাবে বর্ণনা করা যায়।

হুজুর (দঃ)-এর কবর মুবারক কাঁচা অবস্থায় আছে। তার বাইরে পাথরের তৈরী চারকোনা কামরা আছে মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে। যার উপরে একটি ছোট গম্বুজ আছে। তার বাইরে পাঁচ কোনের দেওয়ালে ঘেরা আছে। যেটা মজবুত ও পাথর দিয়ে তৈরী করা আছে। পূর্বে ওর উপরে কভার চড়ানো থাকতো যা আজও তার উপরে আছে। এই ঘেরার বাইরে লোহা ও পিতলের জালী আছে। আমি ও আপনি ঐ জালীর সামনে গিয়ে নিজের দরূদ ও সালাম পেশ করি। এই সকল নির্মাণের চতুর্দিকে ঘিরে আছে মসজিদের নির্মাণ ও মসজিদের ছাদে ঠিক রওজা মুবারকের উপরে সবুজ গম্বুজ আছে। রওজা মুবারকের পাশের দেওয়ালে কোন জানালা বা দরজা নেই। উপরের দুটি গম্বুজে কেবল ১টি করে ছোট সুরঙ্গ

আছে। দুটি একই দিকে, রওজা মুবারক থেকে আকাশ দেখা যায় ও সূর্য্যের আলো রওজা মুবারকে পড়ে।

রিয়াজুল জান্নাত, মেম্বার ও খুঁটির বর্ণনা

(১) জান্নাতের বাগান

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (দঃ) বলেছেন, আমার বাড়ী ও মেম্বারের মাঝে যে স্থান আছে উহা জান্নাতের বাগানের মধ্যে একটি বাগান ও আমার মেম্বার কিয়ামতের দিন হাউজে কওসারের উপরে থাকবে। পূর্বে রিয়াজুল জান্নাতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ 15x26.5 মিটার ছিলো। এখন যেহেতু কিছু অংশ জালীর মধ্যে চলে গেছে, এইজন্য বর্ত্তমান 15x22 মিটার আছে।

(২) মেম্বার শরীফ

প্রাথমিক অবস্থায় হুজুর (দঃ) মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের সাহায্য নিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টদায়ক ছিলো। এইজন্য সাহাবায়ে কেরাম তিনটে সিঁড়িওয়ালা ১টি মেম্বার তৈরী করেছিলেন। হুজুর (দঃ) তৃতীয় সিঁড়িতে বসতেন ও দ্বিতীয় সিড়িতে কদম মুবারক রেখে খুতবা দিতেন।

এই মেম্বারটি কাঠের ছিল। যখন দুর্বল হয়ে যায় হজরত আমীর মোয়াবীয়া নুতনভাবে সিড়িওয়ালা ১টি মেম্বার তৈরী করেন। তারপর কয়েকবার পরিবর্ত্তন করা হয়। বর্ত্তমান যে মেম্বারটি আছে ৯৯৮ হিজরীতে বাদশাহ মুরাদ সোম উসমানীর পাঠানো ১২টি সিড়ি বিশিষ্ট। সৌদি সরকার তার উপরে সোনার পালিশ ইত্যাদি করে খুব সুন্দর করে রেখেছেন।

মেম্বার কয়েকবার পরিবর্ত্তন করা হয়েছে কিন্তু স্থান আজও ঐ আছে যেটা হুজুর (দঃ) এর যুগে ছিল।

নাসায়ী শরীফে হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন আমার মেম্বারের পায়া বেহেস্তের সিঁড়ি হবে।

(৩) মেহ্‌রাবে নবভী (নবীজীর মেহ্‌রাব)

যে স্থানে হুজুর নামাজ পড়তেন তাঁর ইন্তেকালের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হুজুর (দঃ)-এর সেজদার স্থানে দেওয়াল তৈরী করে দিয়েছিলেন যাতে হুজুরের (দঃ) সেজদার স্থানে কারো পা না পড়ে। চার খলিফার যুগে কোন মেহরাব ছিলনা। ৯১ হিজরীতে হজরত উমর বিন আঃ আযীয নিজের রাজত্বকালে ঐ দেওয়ালকে একটি মেহরাবের আকার দেন যা আজও বর্ত্তমান আছে। এখন যে কেহ ঐ মেহরাবে নামাজ পড়বে হুজুর (দঃ)-এর কদম মোবারকের স্থানে সেজদা করবে।

ঐ মেহরাবের পিছনে দেওয়ালে একটি খুঁটি আছে, যাকে সুতুনে হানানাহও বলা হয়। ঐ স্থানে পূর্বে একটি খেজুরের গাছ ছিল। হুজুর (দঃ) ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন ও নফল নামাজ পড়তেন।

বর্ত্তমানে যে মেহরাবে বা মুসাল্লায় ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ান তাকে মেহরাবে উসমানী বলা হয়। কেননা ইহা হজরত উসমান (রাঃ) তৈরী করেছিলেন। হজরত উমর ফারুক (রাঃ) কে নবীজীর মেহরাবে খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে শহীদ করেছিল। যখন মসজিদকে বিস্তার করা হয় হজরত উসমান কেবলার দিকে মসজিদকে বিস্তার করে নুতন মুসাল্লা বা মেহরাব তৈরী করেন ও প্রথম সফকে জালী দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন যাতে ঐভাবে নামাজের মাঝে আক্রমণ না করে। বর্ত্তমানে ঐ জালী নেই তবে মেহরাব ওখানেই আছে।

(৪) সুতুনে আয়েশা

হুজুর (দঃ) বলেছেন, আমার মসজিদে একটি স্থান এমন আছে, যদি লোক তার ফজিলত জানতো তাহলে সেখানে নামাজ পড়ার জন্য নিজেদের মধ্যে পালাক্রমের ব্যবস্থা করতো। যেহেতু হজরত আয়েশা (রাঃ) ঐ স্থানের চিহ্ন দিয়েছিলেন এইজন্য একে সুতুনে আয়েশা বলা হয়।

(৫) সুতুনে আবু লুবাবাহ.

খন্দকের যুদ্ধের পর হজরত আবু লুবাবার (রাঃ) অনিচ্ছায় একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল যার জন্য তিনি খুব দুঃখিত ও লজ্জিত ছিলেন। তৌবা ও ইস্তেগফার করেন। নিজেকে ঐ সুতুনে (খুঁটি) বেঁধে নিয়েছিলেন ও অঙ্গীকার করেছিলেন যতক্ষণ আল্লাহ আমায় ক্ষমা না করেন আমি এই সুতুনের সঙ্গে বেঁধে থাকবো।

আল্লাহ পাক তার তৌবা কবুল করেন ও তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। এই সুতুনকে এইজন্য তার নামে স্মরণ করা হয়। এখানে হুজুর (দঃ) নামাজ পড়তেন।

(৬) সুতুনে সারীর

এই স্থানে রমজানের শেষ ১০ দিনে এতেকাফে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্য বিছানা বিছানো হতো। হুজুর (দঃ)এর পর উমর ফারুক (রাঃ) এই স্থানেই এতেকাফ করতেন। হজরত ইমাম মালিক মসজিদের ঐ স্থানেই বসতেন।

(৭) সুতুনে হুর্‌স

এই সুতুনের নিকটে ঐ সকল সাহাবা বসতেন যারা রসুলুল্লাহ (দঃ)এর হেফাজতের জন্য লিপ্ত থাকতেন।

(৮) সুতুনে ওয়াফুদ

যখন আরবের দুত রসুলুল্লাহর (দঃ) কাছে উপস্থিত হতো হুজুর (দঃ) এই স্থানে দুতের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন।

সুতুনে সারির, সুতুনে হারস ও সুতুনে ওয়াফুদ বর্ত্তমানে অর্ধেক স্থান জালীর মধ্যে চলে গেছে।

সাহাবায়ে কেরাম নামাজের জন্য সুতুনের দিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতেন কেননা সুতুন অন্য নামাজীর জন্য আড় হওয়ার কাজ দেয়। হজরত ইমাম বোখারী হজরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি দেখেছি বড় বড় সাহাবা মগরিবের সময় মসজিদে সুতুনের দিকে দৌড়াতেন। সাহাবায়ে কেরাম সুতুনের কাছে নামাজ পড়েছেন এই জন্য ঐখানে নামাজ পড়া উত্তম।

শেষ সালাম

হুজুর(দঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিজের সমগ্র জীবন ও সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছিলেন যাতে ইসলাম জগতের কোণায় কোণায় পৌঁছে যায়। তাঁদের ত্যাগের জন্য ইসলাম আমরা পেয়েছি। তাঁরা আমাদের কাছে এই আশাই রাখেন যে প্রথমে নিজে ইসলামের উপরে চলি ও ঐ কাজ যা তাঁরা ছেড়ে গেছেন তা আগে বাড়াই। আল্লাহতায়ালা কুরান শরীফে ঘোষণা করেছেন যে তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা দরকার যে মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করবে ও অসৎ কাজ হইতে বাধা দেবে।

যদি আমরা চাই যে হুজুর (দঃ) দয়ার দৃষ্টি আমাদের উপর থাকে তাহলে আমাদের জন্য উচিৎ যে তাঁর আশা আমরা পূর্ণ করি। আর যদি আমরা মনে করি যে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়ে বড় বড় নিয়ামতের কথা পড়ে ও তাঁর সঙ্গে ভালোবাসার দাবী করে আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করে নেব এটা আমাদের ভুল ধারণা।

হুজুর (দঃ)-এর পবিত্র সমাধির সামনে সর্বপ্রথম আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করি। ও হুজুর (দঃ)-এর কাছে আবেদন করি যে আল্লাহতায়ালার কাছে আমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। পুনরায় হুজুর (দঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করি যে আগামী জীবনে আমরা পূর্ণভাবে ইসলামের উপরে চলবো। হুজুর (দঃ)-এর কাছে আরো দরখাস্ত করা যে আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করুন যে আল্লাহ আমায় ও সকল মুসলমানকে ইসলামের উপর পূর্ণভাবে চলার তৌফিক দিন ও কিয়ামতের দিনে হুজুরের (দঃ) সুপারিশ নসিব হোক।

দয়ার সাগর, দুই জগতের বাদশা যার আপনার উপর আপনার চেয়ে বেশি হক আছে। তাঁর উপর যতই দরুদ ও সালাম পাঠানো হোক না কেন তুলনামূলক কম হয়। তবুও যতটা আপনার দ্বারা সম্ভব দরুদ ও সালামের উপঢৌকন পেশ করে নিজের দেশের জন্য রওনা হয়ে যান।

নিজের দেশে সফরের প্রারম্ভে এক নুতন ইসলামী জীবনের প্রারম্ভ করুন। আল্লাহতায়ালা আমায়, আপনাকে ও বিশ্বের মুসলমানকে ইহকাল ও পরকালে সম্মানীয় ও কৃতকার্য্য করুন। আমীন।

জান্নাতুল বাকীর সমাধিস্তদের উপর এইভাবে সালাম পড়ুন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ، فَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ.

অর্থ ঃ—এইস্থানে (কবরস্থানে) আরামরত মুসলমানদের জামাত। তোমাদের উপর আল্লাহর সালামতি হউক।

তোমরা পূর্বে পৌঁছে গেছো আমরা তোমাদের পরে আসছি।

আমরা ইনশাআল্লাহ তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবো।

হে আল্লাহ বাকীওয়ালদের ক্ষমা করো
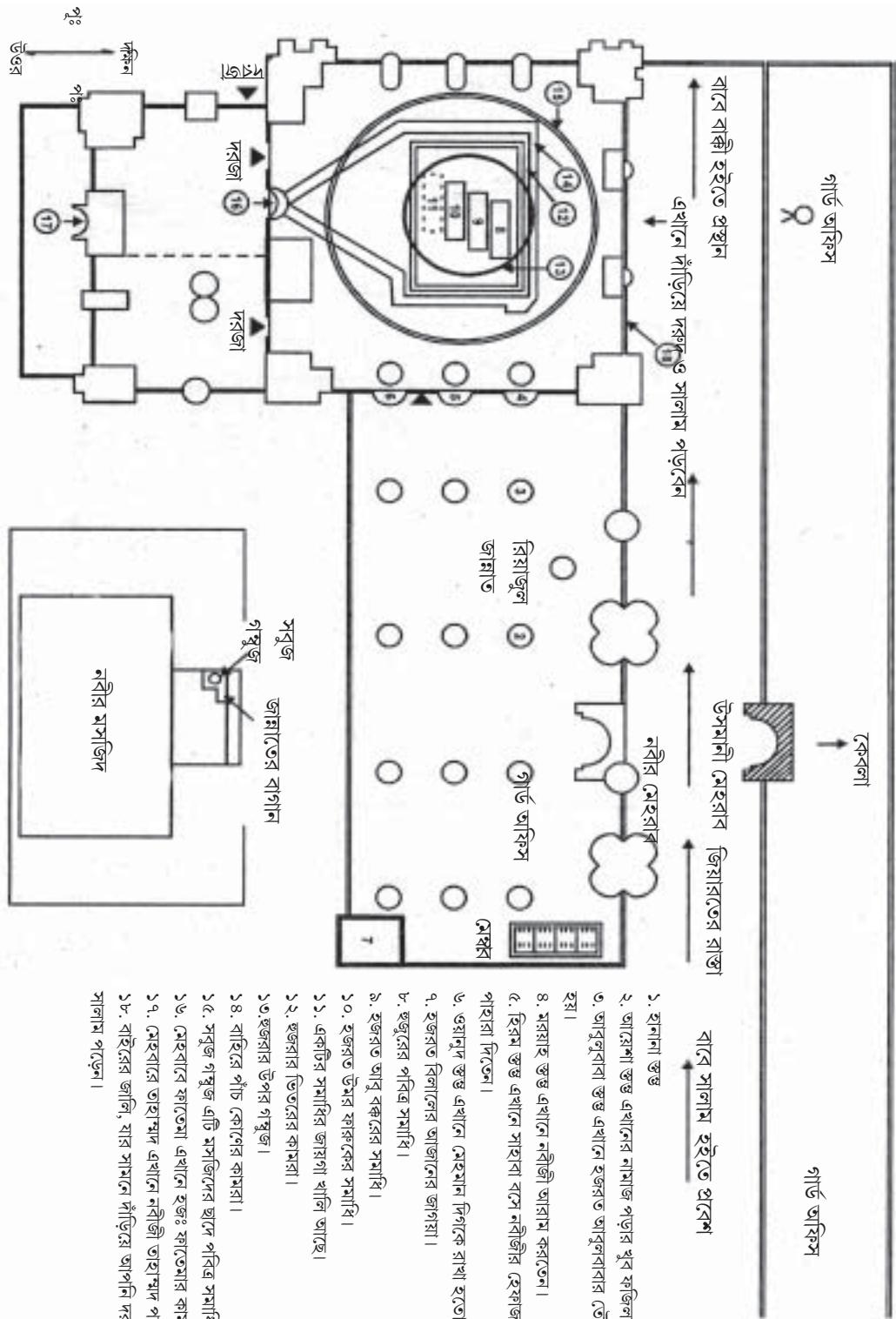
হে আল্লাহ আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করো

আমাদের উপর আল্লাহতায়ালার রহমত হউক তোমাদের মধ্যে যে পূর্বে পোঁছেছে ও যে পরে পৌঁছাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

এই বই-এ হজ্ব সংক্রান্ত সম্পূর্ণ শিক্ষা নেই। সেহেতু এই বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন অভিজ্ঞ আলেমের কাছে হজ্বের শিক্ষা ও পদ্ধতি শিখতে থাকবেন। তাছাড়া হজ্বকে সফল ও প্রভাবশালী করার জন্য আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে বসা-ওঠা রাখুন।

শেষে পাঠকদের কাছে আবেদন যে এই অধমের মাধ্যমে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে এই বই-এ উল্লেখ ঠিকানায় লিখে পাঠিয়ে দিন কিম্বা ফোনের মাধ্যমে অবগত করান। আমি কোন আলেমে দ্বীন নই। এই জন্য ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। অবগত করানোর পর ইনশাআল্লাহ আগামী মুদ্রনে সংশোধন করা হবে।

এ ছাড়া সকল পাঠকের কাছে আবেদন করি যে এই অধমের জন্য দ্বিতীয়বার বায়তুল্লাহ দর্শনের দোয়া করুন।

হজরত আয়েশার কামরা ও রিয়াজুল জান্নাতের (জান্নাতের বাগান) চিত্র

হজ্ব সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ ভুল ধারণা

★হুজুর (দঃ) ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করার উপর কঠোর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বহুলোক এই অজুহাত দেখিয়ে থাকেন যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার মতো কেউ নেই। সন্তানরা ছোট ছোট ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকাল কিছু ট্যুর-কোম্পানী কেবল ৭ থেকে ১০ দিনে হজ্ব করিয়ে থাকেন। এতো পন্থা ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করা একটি বিশেষ ভুল।

★কিছু লোকের কাছে অর্থ থাকে না তবুও হজ্বের জন্য অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন। এটা খুবই ভুল ও মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কাবণ। যখন আপনার কাছে অর্থ থাকবে তখনই হজ্ব ফরজ হবে। তখন হজ্ব করুন। সাহায্য চেয়ে কষ্ট না দেওয়া উচিৎ।

★হুজুর (দঃ)-এর একটি হাদিসের অর্থ যে লোকেরা তিনটি কারণে হজ্ব করবে। অর্থশালীরা ভ্রমণের জন্য হজ্ব করবে, গরীবরা ভিক্ষার জন্য হজ্ব করবে ও মধ্যবিত্তরা ব্যবসার জন্য হজ্ব করবে। এই তিনটি কারণে হজ্ব করা বড় ভুল।

★উমরাহ ছোট হজ্ব ও হজ্ব বড় হজ্ব। তাতে যেকোন দিনই হোক না কেন বড় হজ্ব (হজ্বে আকবর) গণ্য হবে। কেবল শুক্রবারের হজ্বকে হজ্বে আকবর গণ্য করা ভুল ধারনা।

★ নিজ হজ্বের আলোচনা বারবার করা যাতে লোক আপনাকে হাজ্বী বলে জানতে পারে—এটি একটি রিয়া (লোক দেখানো), এটি একটি বড় ভুল।

★হজ্বের সফরে বাড়ী থেকে কাফন নিয়ে যাওয়া ও একে হজ্বের একটি অংশ মনে করা ভুল। ৫০ বৎসর পূর্বে সৌদি আরব একটি গরীব দেশ ছিল হজ্বের সামুদ্রিক ও ভূমির রাস্তাও খুব কঠিন ছিল। এমত অবস্থায় যদি কারো ইন্তেকাল হয়ে যেতো খুব অসুবিধায় পড়তে হতো। এইজন্য হাজ্বীরা নিজের সঙ্গে কাফন রাখতেন। বর্তমান সৌদি আরব একটি বিশেষ ধনী দেশ। সফরও সহজ হয়ে গেছে। প্রতি স্থানে কাফন সহজেই পাওয়া যায়। এইজন্য কাফন সঙ্গে নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

★ লোক হজ্বের পূর্বে হজ্বের পদ্ধতির শিক্ষা নেন না ও হারাম শরীফে ৪০ দিন কিভাবে কাটাবেন তারও শিক্ষা নেন না। এইজন্য কখনো তাদের নিজের ভুলের জন্য অথবা কখনো ট্যুর বা ভারতীয় দূতাবাসের মজবুরীর বা অলসতার কারণে হাজ্বীদেরকে কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যিনি কষ্ট পাবেন প্রথমে এটা জানার চেষ্টা করবেন যে এর কারণ কি? পুনরায় আইন অনুযায়ী ও অন্য পদ্ধতিতে চেষ্টা করবেন যাতে অন্য হাজ্বীদের এমন কষ্ট না হয়। হজ্বের মাঝে নিজের কষ্টের কথা বারবার আলোচনা করলে লোক হজ্বের সফর করতে ভয় পাবে ও হজ্ব না করার বা দেরী করার অজুহাত সন্ধান করতে থাকে। এইজন্য নিজের কষ্টের কথা এমনভাবে আলোচনা করা যাতে লোক ভয় পাবে, এটি ভুল কাজ। হজ্বের সফরে যত কষ্ট আপনি পাবেন আল্লাহতায়ালা আপনাকে তার প্রতিদান দেবেন।

★মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মসজিদে ইবাদতের মজা ও মসজিদের নূরানী পরিবেশ জান্নাতের চেয়ে কম নয়। এইজন্য হজ্বের পর বহুদিন পর্যন্ত লোক সেই শান্তিতে মগ্ন থাকে ও অনিচ্ছায় লোকের মুখ থেকে ওখানের এমন প্রশংসা শোনা যায় যে অন্তরে ওখানের ইবাদতের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গরীবদের কাছে এমন আলোচনা হইতে বাঁচা দরকার, যাতে তাদের অন্তর নিজ প্রভুর ঘর ও নবীজীর গম্বুজ দেখার জন্য আগ্রহ হয় ও নিজের মজবুরী ও দুর্বলতার জন্য নিরাশ ও দুঃখিত হয়ে যায়। কোন মুসলমানকে দুঃখ দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া বড় গোনাহ।

★হজ্ব নামাজের মতই একটি ইবাদত। হজ্বের সফরে মহত্ব, পূর্ণতা, সততা ও নম্রতার সঙ্গে রওনা হওয়া উচিৎ। ফুলের মালা পরে ঢোল বাজনার সঙ্গে বাড়ি থেকে রওনা হওয়া ইসলাম বিরোধী পদ্ধতি ও রিয়াকারী।

★ইসলাম কোন মহিলাকে বিনা মুহরিমে কোন সফরের অনুমতি দেয় না ও তার সঙ্গে নির্জনে থাকারও অনুমতি দেয় না। একজন মহিলা তার বয়স যাই হোক না কেন যদি বিনা মুহরিমে হজ্বের সফরে যায় একটি বড় গোনাহ এবং হারাম শরীফের একটি গোনাহ একলক্ষ গোনাহের সমতুল্য।

★ লোকের কাছে হজ্ব না করার একটি অজুহাত যে আমার অর্থ হালাল বা শুদ্ধ নয়। প্রথম কথা এই যে যদি অর্থ হালাল না হয় তাহলে উপার্জন কেন করছেন? দ্বিতীয় কথা এই যে হজ্ব ধনসম্পদ আসার পর ফরজ হয়। কেবল হালাল ধনসম্পদ আসার পর নয়। যখন আপনি আপনার সম্পদ থেকে খাওয়া পরা করছেন, বাচ্চাদের লালন পালন করছেন তাহলে হজ্বও করুন। আর যদি না করেন আল্লাহতায়ালা মুখাপেক্ষীও নন। আর তিনি ক্বাহহার ও জাববার। তাঁর কোন ইবাদতের প্রয়োজন নেই। তিনি ওয়াদাও করেছেন যে আমি জাহান্নামকে মানুষ ও জ্বীন দিয়ে ভরিয়ে দেবো।

আরাফাতে চাওয়ার দোয়া ও ওজিফা

ক্রম	দোয়া	পরিমাণ
১	لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك	খুব বেশী পড়বেন
২	لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير	খুব বেশী পড়বেন
৩	قل هو الله احد ۝ الله الصمد ۝ لم يلد ۝ ولم يولد ۝ ولم يكن له كفوا احد ۝	১০০ বার পড়বেন
৪	اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ۝ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ۝	১০০ বার পড়বেন
৫	استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.	১০০ বার পড়বেন
৬	لا اله الا الله محمد رسول الله.	১০০ বার পড়বেন
৭	لا اله الا انت سبحنك اني كنت من الظلمين	১০০ বার পড়বেন
৮	يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.	১০০ বার পড়বেন
৯	ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (البقرة: ٢٠١)	১০০ বার পড়বেন
১০	رب اغفر وارحم وانت خير الرحمين ۝ (المومنون: ١١٨)	১০০ বার পড়বেন
১১	الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد.	১০০ বার পড়বেন
১২	এই সুরাগুলোও পড়বেন—সুরা ইয়াসীন, সুরা রহমান, সুরা মুল্‌ক, সুরা তওবা, সুরা ওয়াকেয়াহ ও সুরা ফাতাহ	
১৩	আসর পর্যন্ত খুব বেশি দোয়া চাইবেন। যদি খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে পড়েন তাহলে খুব উত্তম হয়। হজ্বের বইয়ে আরাফাতের দিনে পড়ার জন্য অনেক দোয়া লেখা আছে। ঐগুলো হজ্ব শেখার সময় পড়ে মুখস্ত করে নেবেন। আরাফাতের দিনে এই দোয়ার অর্থ বুঝে বিনয়তার সঙ্গে আল্লাহর কাছে কাঁদুন। দোয়া চান। বুঝে যে দোয়া আপনি চাইবেন তার প্রভাব থাকবে।	

বি. দ্র.—উপরে যা কিছু ওজিফা ও ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো এটা কেবল সুন্নত তরীকা। ওয়াজেব বা ফরজ নয়।

জান্নাতুল বাকীর একটি অমুল্য নকশা